





# ভানুমতির খেল

প্রদ্যোৎ গুহ



৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

প্রকাশক :

দেবীপ্রসাদ গুহ

৮৯ এ, ষষ্ঠীন্দ্রমোহন গ্রোভিল্ডা

কলিকাতা

মুদ্রাকর :

নীরদরঞ্জন চৌধুরী

প্রকাশিকা লিঃ

( নববিধান প্রেস )

৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রাট

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীশ্রী বুক এজেন্সী

১২ বংকিম চাট্‌জেজ ষ্ট্রিট

কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :

ভাদ্র, ১৩৫৯

দাম : দুই টাকা

মা ও বাবাকে



ভানুমতীর খেল, অরণ্য, মুহূর্ত, আগষ্ট ১৯৪২  
কানাগলি, চাঁদ, রক্ত, দারোগার বৌ  
দুঃসংগ, হাসপাতাল, পুতুল  
শয় ঘট, জননী  
প্রত্যাবর্তন

## ভানুমতির খেল

ভানুমতির খেল...

মেলায় মধ্যে এই বেথাপ্লা তাঁবুটার আকর্ষণই সব চাইতে বেশি। ভিড জমেছে চারিদিকেই। কোতুললী চোখ তাঁবুর ছিদ্র খোঁজে।

প্রতি বছরই এই সময় মেলা বসে। নানাধিধ পণ্যের বিচিত্র বিপণী, নানাবকম মানুষ আর ডে-লাইটের আলোয় সজীব হয়ে ওঠে বাণীডাণের মাঠ। আশে-পাশের চাষীদের গা ভেঙে মানুষ আসে মেলা দেখতে।

নাগরদোলাব আকর্ষণটা কোনবকমে কাটান গেছে। স্বামীব কৌচাব খুট শক্ত করে ধরে গ্রামের বে অল্প-বয়সী মেয়েটি এসেছিল মেলা দেখতে, ভীক চোখ মেলে সেও আবদাব না জানিয়ে পাবল না :

খেলা দেখাইবা ? ছোটকালে একবার দেখছিলাম—বড় ভাল করে।

খেলা দেখবা ? নিবাস করতে ইচ্ছা করে না মেয়েটাকে। তা'ছাড়া মানুষটার নিজের আকর্ষণও কম নয়।

মেলা বসে ধান ওঠবার পর। স্তবৎ এ সময়টা হাতেও পয়সা থাকে।

আসেন আসেন—মাত্র দুই পয়সা—বিশ্ববিখ্যাত যাজকব পেদেছাব মনতোর হালদাবের ভানমণিব খেল—আসেন—আসেন দেবি কবলে জামগা পাঠিবেন না।

মাত্র দুই পয়সা ! নিবাস করতে ইচ্ছে কবল না মেয়েটাকে।

বাইরে বিচিত্র পোষাক পরিহিত লোকটা তান্দ্রাবে চিংকণ কবেই চলেছে।

ভিত্তবে খেলা শুরু হয়ে গেছে।

ডুগডুগ্—ডুগডুগ্

ডুগডুগি বাজিষ আসবে অবতীর্ণ হালেন গ্রামদাৰ মনতোর হালদাব। ছেয়ে রঙব ছোপধবা কালো কোট। বুকব ওপব সেদটিপিন দিয়ে লটকানো চীনে বাজারে কেনা গোটাকয়েক রঙ্চটা মেডেল। বিবর্ণ বে-চপ কালো

প্যাণ্টের পিছনে নীলরঙের একটা তালি। কোটের ঢোকা চোখ ছুটো বন-  
বন করে পুরছে।

ঈ নাহকর বটে!

সঙ্গী চোখগুলো উদগ্র হয়ে উঠেছে।

মস্তুর জানে নারে? আঙুল চুমতে চুমতে ছোটভাই বড়ভাইকে জিজ্ঞাসা করল।

ধাব বোকা, সব হঠল হাত সাফাই—শোনাখাটা বিজ্ঞের মত ছোট-  
ভাইকে শুনিয়ে দিল বড়ভাই।

খেলা শুরু হল।

আপনাগো মধ্যে বে কেউ আমার হাতের গিকা একটা তাস ত্রান।

হাতের মধ্যে উণ্টো করে এক প্যাকেট তাস মেলে ধবে বলল মনতোষ।

ত্রান, ত্রান ভয়ডা কি। হ, ভাল কইরা দেইগ্যা রাখেন, পাশের মাইনবেরও  
দেখান। হইছে? বাস, এইবার ত্রান দেখি এই তাসের নষ্টো আপনারডা  
ঢুকাইয়া। বেশ ভাল কইরা বাইটা ত্রান এইবার।

তাসগুলো ফিরিয়ে নিয়ে হাতের বাগদও ছুঁয়ে বিড়বিড় করে কি জানি  
সব মস্ত পড়ল। তারপর নিভুল তাসটা বের করে বিজয়ার মত জিজ্ঞাসা  
করল :

ক্যামন, এইটা আপনার তাসতো? ত্রাথেন ত্রাথেন ভাল কইরা ত্রাথেন।  
কমু ক্যামন আমারগতো ভুল হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে শুনিব ও মতিভ্রম  
হয়।

বড়ভাইও ইতিমধ্যে আঙুল পুরে দিয়েছে মুখে। গ্রাম্য বোট স্বামীর  
গা ঘেঁসে বসেছে আর একটু। ভীক চোখ ছুটো বিষয়ে গোল হয়ে উঠেছে।

তারপর টাকা জল করা হল। পয়সা বৃষ্টি হল শূন্য থেকে। এইবার  
আসল খেলা।

ডুগডুগ—ডুগ ডুগ! ভানমতির খেল।

আবছা অন্ধকারে রক্তময় হয়ে উঠেছে তাঁবুর ভেতরটা।



গুরুদেব এই বিজ্ঞা দিছিলেন মাত্র দুই জনরে—তার মইধো গণপতি গন্ত হইছেন।—দ্রোপদীর গালেব বেত্রাস্ত শোনে নাই—বতই থাও গালের ভাত' কিছুতেই ফুরাইত না। এই বাটিটাও সেই রকম, ঢাকা দিলেই খালি বাটিতে চাউল আইয়া পড়ে। কিষ্টঠাকুর এই মন্তই শিখাইছিলেন দৈপদীরে। ক্যামন, এই বাটি দুইটা খালিতো?

একটা খালি চীনে মাটির বাটির উপর আব একটা দিয়ে ঢাকা দিতে দিতে বলল মনতোষ হালদার। বাছদণ্ড ছু ইয়ে ময় পড়লো। তারপর ঢাকা খুলতেই দেখা গেল একবাটি চাল।

দর্শকেরা স্তব্ধ, বিস্মিত।

তীব্র থেকে বেবিয় গায়ের মেয়েটা তার স্বামীকে বলল:

মন্তরের কোন আছে কিন্তু—অগো আবাব চাউলের অভাব কি!

মনতোষের দৌ বাতাসী কিন্তু বলে:

মন্তর না ছাই! মন্তর জানেতো চাউল বাইব কবক না দেখি—মেলায় মেলায় ঘোরণেব কি কাম—পয়সা দিয়া চাউলই বা কেনে কান?

সবদা ব্যাভাব করলে মন্তরের জোঁর থাকে নাকি! বুঝ দেবার চেষ্টা করে মনতোষ।

খেলা দেখাইবো না? আরে খেলা না দেখাইলে চেন্ণ কে প্রোফেছার মনতোষ হালদারের। নাম—নামডাই তো আসল।

বাতাসীর মায়ের পেটের ভাই গনেশের ভক্তিটা আবাব বেশি। মনতোষকে ভজিয়ে যদি কয়েকটা খেলা শিখে নেওয়া যায়। বিচিত্র পোশাক পবে সাকরেরদী করে বেড়ায় মনতোষের। বেপাপ্পা তাঁবুটার সামনে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চৈচিয়ে লোক জড়ো করে।

নামডাই আসল—নিস্তারিণীরও তাই মত। বাপ পিতাম' সকলেই তো হাল চষেছে—ধানও তুলেছে গোলা ভরে। শস্তর ভাস্করের প্রতি অশ্রদ্ধা করতে নেই। কিন্তু গেরামের লোক ছাড়া কেউ কি চেন্ণ তেনারগো?

প্রথম ঘেবার রাণীডাঙার মেলা থেকে খেলা দেখিয়ে নগদ পাঁচ টাকা এনে দিয়েছিল মনতোষ সেইবার নিস্তারিণী গৌ ধরে বসলো :

বিয়া দেও পোলার এইবার

ও হারামজাদার বিয়া দিয়া কি হইল। এতখানি বয়স হইল হাল দিতে শেখল না এখনও—পরের বাড়ির ঝি আইছা কষ্ট দেওনের কি কাম? বারবার আপত্তি করেছিল প্রাণকৃষ্ণ।

কিন্তু কোন কথায় কান দেয়নি নিস্তারিণী।

হাউলা চায়া না হইলে মাইনবেরে তোমরা তো মানুষ কইরাই গ্যান করতে চাও না—দ্বাশ বিছাশের লোক মস্তার কত প্রেংসা কবে, তোমারে চেনে কেডা?

স্তত্ত্বাং চুপ করে যেতে হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণকে।

বিয়ের রাতে অল্প বয়সী মেয়েটাকে একেবারে ভডকে দিয়েছিল মনতোষ।

দেখি দেখি তোমার কানেক মধ্যে ওড়া কি—

বিনাস্ত বিহ্বল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। চট্ করে ওর কানের মধ্যে হাত দিয়ে আস্ত একটি রূপোর টাকা বের করে এনেছিল মনতোষ।

কানের মইধ্যে টাকা ছিল একটা।

তারপর মেয়েটার বিষয়ে অলঙ্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বোপ হয় মায়া হয়েছিল। তাই বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে বলেছিল :

বোঝ্‌লা না, এয়া হইল ম্যাজিক

পরে কিন্তু বিরক্ত হত বাতাসী :

রঙ্‌ তাগসা ভালো লাগে না সব সময়—কামেব কাম নাই অকামের গোমাই! বসি লাঙ্গল দেওনের বাবস্তা কদলা না বে—ধান পাটবা কই?

তরগো আবার ধানেক অভাব! গদেশ বলে, দাদার ভান্নমতির খেল যতক্ষণ আছে—ভাবনাডা কি

বাঁকা ধারালো একটা বাহাদুরীর হাসি দৃটিয়ে তোনে মনতোষ। বাড়কর মনতোষ হালদার কি একটা কেউকেটা!

তিন দিন পরে মেলা ভাঙে। একটা অতিকায় জানোয়ারের নোংরা পিঠের মত এবড়ো খেবড়ো হয়ে ছড়িয়ে থাকে রাণিভাঙার মাঠ। ইতস্তত পড়ে থাকে ভাঙা বাশ আর দড়ির টুকরো—মেলার ধ্বংসাবশেষ। ব্যবসা পণ্ডর গুটিয়ে ফিরে যায় সবাই; হিসাব করে আর মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে। বেচাকেনা ভালই হয়েছে। চাষীর হাতে পয়সা ছিল এবার। ধান উঠতে না উঠতে বড় বড় নাও নিয়ে কতগুলি মানুষ এসে হাজির হয়েছিল। দেড়গুণ, দু'গুণ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে সব ধান। হাত ভরে পয়সা পেয়েছে সবাই। মনের আনন্দে সপ্তদা করেছে মেলা থেকে।

অনেক মন এমন বেচাকেনা হয় নি—খুশি দেখায় সকলকে।

কত হইলরে গণশী—কত দেখলি গইছা?

দুই কুড়ি দশ টাকা

ঘরেব চালটা এইবার ছাইয়া লগুন বাইব—কি কস?

হ তাতো গাইবই—কয় আডি বা খড়ের দরকার!

আগে কই নাই তরে—পকেটে হাত দিন মনতোবা। তাপপর রহস্যময় ভাবে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ—যেন নতুন কোন ম্যাজিক দেখাচ্ছে। অবশেষে পকেট থেকে একজোড়া কাচের চুড়ি বের করে বললঃ তর দিদির জইছা কিনছিলাম, দ্ব্যখতো কামন হইল, পছন্দ হইব তো?

সুন্দর, পছন্দ নী হইলেই হইল—মিইয়ে বাওয়া স্বরে সায় দিল গণেশ। সামান্য একজোড়া কাচের চুড়ি তাহ নিয়ে এত লুকোচুরি!

কিন্তু হাওয়ায় মিচিয়ে গেল স্বপ্নের বৃদবৃদ। দেবতা ভ্রূণুটি করলেন। দোলায় গমন করেছেন দেবী—ফল দুভিক্ষ। শাদ্রবাক্য মিথ্যা হবার নয়। নইলে ধান তো আর কম হয়নি এবার।

চাল চাল করে ঘুরে এসে অসহায় জটলা করে মানুষগুলোঃ

ইস, কি মাটি খাইছি—বেশি টাকার লোভে বেইচা দিলাম ধানগুলান

মাটি বইলা মাটি! কিন্তু একটা উপায় তো বাইর করতে হয়—

উপায়? একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের ধোয়াটে শীতল অন্নভূতি পাক  
থেয়ে ওঠে।

কোন এক পাগলা বাহুর তার হাড়ের বাহুদণ্ডটা ঘুরিয়ে নিয়েছে  
খানের গোলাগুলির উপর। শত গোলা ছুঁচো ইঁতরেব লীলাক্ষেত্র।

নৈখ্য কোণে ছোটো শকুন পাক থেয়ে গেল। দেবতা কষ্ট হয়েছেন।  
মড়ক।

চাউল ফুরাইয়া গেছে— একদিন সকালে শেব কথা জানিয়ে দিল বাতাসী।

অনেক ঘুরে পচিশ টাকা দিবে একমণ চাল কিনে এনেছিল মনতোষ।  
কিন্তু একমণ চালে তো আব লারা বছর চলতে পারে না।

ফুরাইয়া গেছে— অতীন্দ্রদেব মত শোনায় মনতোষের কথা। 'তইলেত'  
চাউলেব চেঁচায় বাইর হওন লাগে— কি কসরে গণশা?

হ, বাইর হওন লাগে— অনিশ্চিত ভাবে সায় দেয় গণেশ।

তারপর এলোপাখাড়ি খানিধং ঘুরে এসে গুম হয়ে বসে থাকে। উল্লুনের  
আগুন নিভিয়ে দিয়ে শাল পাড়ে বাতাসী : ম্যাজিক কবে, ম্যাজিক— কামের  
কাম নাই অকামেব গোসাত। বউ পোলারে খাওয়াইতে পারে না— গলায়  
দড়ি অমন মাইনবের! মস্তব না ছাই—

সব্বদা ব্যাভার করণে মস্তরের জোব থাকে নাকি— পুরান কথায় বুঝ  
দেবার একটা দাঁপ চেঁচা কবে মনতোষ।

হইছে, অত ভ্রনতির (ভনিতা) কাম কি! মস্তব ধুইয়া জল খাইব  
মাহনবে—

অবশেষে যেন একটা তৃণখণ্ড পাওয়া গেল। শ্রমশানের বটতলায় এক  
সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে। রসিক মাতব্বর আসছি ও পথ দিয়ে।

আগেও নয় পরেও নয়—ঠিক এমন সময়টাতেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের নিশ্চয়ই একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে।

রসিক মাতব্বর গিয়ে পা জড়িয়ে ধরেছিল সন্ন্যাসীব : একটা উপায় দেন বাবা—উপায় দেন। ভগমানন্ড আপনারে প্রেরণ করছেন। তেরাণ করেন—সমস্ত গ্রামের আত্ম আকৃতি যেন ঝড়ে পড়েছিল রসিকের কণ্ঠে।

কোন কথা বলেন নি সন্ন্যাসী। বা হাত একমুঠি ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে রসিকের দিকে প্রাসারিত করে বলেছিলেন—ধর।

চক্ষু মুদে ভক্তিতরে গামছা মেলে ধরেছিল রসিক। চোখ খুলে দেখা গেল কোথায় বনো, গামছার ওপর ছড়িয়ে আছে একমুঠি ধূলা। দেবতার আশীর্বাদ!—চাউল পামুতো আমরা, সই কথাটা কতটা দেন ছাব্বতা!

হাতের ইসারায় আর একদিন আসতে বলে দিয়েছেন সন্ন্যাসী।

কথাটা ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে।

হ, মস্তুরের জোর বটে! মুহুর্তে কের মইধো ধূলামুষ্টি কিনা হইয়া গেল ধূলা!

মস্তুর না ছাফ—কেন জানি চটে গঠে মনতোব, ওয়া আমিত্ত পারি।  
ধূলারে চাউল বানাক দেখি তয় না বুঝি—

খুব মাতব্বর হইয়া পড়ছস তুই মস্তা—সেতে পড়ে রসিক মাতব্বর।  
অত গোমর ভাল না, ধরায়ে সরা জ্ঞান—নরকেও জ্ঞান হইব না তর ছেমড়া—

কেমন জানি একটা গো চেপে বসে। সোজা একদিন বটংগা গিয়ে হাজির হল মনতোব :

ভারী মস্তুর শিখছ—ধূলারে চাউল কর দেখি তয় বুঝি—

প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দিতার আবহানে একটুও বিচলিত দেখায় না সন্ন্যাসীকে।  
স্মিত হাত্রে হাতের ইসারায় বসতে বলেন—বৈঠ বেটা। কেমন একটা অপার্থিব ভাব, বহুচালিতের মত বসে পড়ে মনতোব। তারপব একমুঠো ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন—ধর।

নিতান্ত অবজ্ঞা ভবে হাতটা বাড়িয়ে দিমেছিল মনতোষ। ওর প্রসারিত হাতের ওপর একগুঠো চাল ঝকমক করে ওঠে।

মস্তুর না ছাই—অত্থদিকে চাহাছিলাম এই ফাকে কাম সারছে—

নিজেব কৈদিয়ংটা নিজেরই কেমন বেয়রো লাগে। কিন্তু শুধু মস্তবটা তো কোনদিন পরীক্ষা করে দেখেনি মনতোষ!

বুলো যদি কুল হতে পাবে তবে চাল হতে বাধা কি!

বাবা যে কিছু নেই তার প্রমাণও পাওয়া গেল। বসিক মাতবব আর একদিন গিয়ে ছ'মুঠো চাল নিয়ে এসেছে।

ধূলিমুষ্টি কিনা মুহূর্তেকৈব মধ্যে হইয়া গেল চাউল। কও—এয়ারে মস্তবেব জোব কইবা কি না!

জোবগলায় বলে বেডাল মাতবব।

মাথুষগুলো যেন ভবসা পেল। ভগবানের লীলা বোঝে কাঁব সাধ্য। ছুভিক্ষ দিলেন আবাব ত্রাণকতাও পাঠালেন তিনিই।

হাবাণ গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধবেছিল সন্ন্যাসীর, গিয়েছিল নিতাই পাল, শীতল হাজবা—নিরাশ হতে হুয়নি কাডকেই। পো-টাক চাল নিয়ে এসেছে সকলেই। খুশি মনে. একটাকা কবে দক্ষিণা দিয়ে এসেছে ওরা। সে টাকা ছোয়নি সন্ন্যাসী।

কও এয়াবে মস্তবের জোব কইবা কিনা!

মস্তব না ছাই বুজককী! কিন্তু জোব দিয়ে কথাটা বলতে পারেনি মনতোষ।

কেমন নেন একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। জোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিল মনতোষ। আঃ

ক'রা জানি ভাত রান্‌তাছে—গণেশ বলে।

তাই বটে ভাতেরই গন্ধ! নিশ্চয়ই পরাণের বাড়ি!

রান্‌বো না! সকলে তো আর ম্যাজিক কইরা বেড়ায় না—বউ পোনারে থওয়াইতে পারে না গলায় দড়ি, গলায় দড়ি অমন মাইনখের—অদ্ভুত একটা বিকৃত ভঙ্গী করে বাতাসী।

পরাইছা ও পরাইছা—চাউল পাইলি কই রে? হরি সা কি দিতাছে নাকি? বাগ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করে মনতোষ।

সন্ন্যাসী বাবার কাছ থিকা আনছি! বাই কস্ বাবাব মন্তরের জোর আছে কিছুক।

কেমন জানি নিভে গিয়েছিল মনতোষ। মন্তব? বেবেও বা শুধু মন্তর দিয়ে তো কোন দিন পরীক্ষা করে দেখা হয় নি!

চুডি গাছ দে দেখি।

ছাই মন্তব জানে—বাইব করুক না চাউল, হয় গ্রান বৃষ্টি—জলে উঠেছিল বাতাসী। তবু থুলে দিয়েছিল শেষ চুডিগাছা। গণেশ সেটা নিয়ে গেছে হরি সা'র দোকানে। যদি কিছু চাল পাওয়া যায়।

মন্তব! অবসন্ন ভাবে বোদের মদো বসে থাকে বাহুর মনতোষ হালদার।

এদিকে ওদিকে খানিকক্ষণ ঘুবে ফিরে আসে গণেশ—চাউল দিলনা হরি সা. দাম চড়াইয়া দিছে আরও।

কোন কথা যেন কানে যায় না মনতোষের। একটা জ্বালাময় অনুভূতি পেটের ভিতর থেকে উপর দিকে উঠতে থাকে—মাথাটা ঝিম ঝিম করে!

চাবিটা দেও দেখিছে—

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে মনতোষ।

চাবি দিয়া কি হইব? কত যেন ধনসম্পদ বাথছে বাক্সে—বাক্সার দিয়ে ওঠে বাতাসী। আঁচলের গিট থুলে সশব্দে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চাবির রিঙ।

আয় দৈবিক গণনা—

সোকার মত পিছন পিছন গেল গণনা। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে মনতোষকে।

প্যাটার্ন খুলে বার করল সেহ বড় জগে যাওয়া কালো কোট আর প্যান্ট, হাড়ের বাতদণ্ড আর সেহ দ্রোপদীর বাটি।

পকেটের মনতোষ ভালবাসার ভান্নমতির খেল—

জানানার খাপটা ঢেঁনে দেওয়ায় বরের মধ্যে একটা আবছা অন্ধকার।

ও চাউল বাহর করবেন, বুঝি! তাহলে, আইজ ভাত খামু—বোকাব মন তাস্তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল গণেশ। একটা প্যান্ট পরিহিত বাড়করের চোখ দুটো বন বন করে ঘুরতে। পাটা হঠাৎ হুম হুম করে ওঠে গণেশের।

উচু একটা টুলের ওপর ঢাকা দিয়ে রাখা হল বাটিটা।

বিড় বিড় কর মত পড়ে হাতের বাতদণ্ডটা ঘুরিয়ে নিল বাটির ওপর দিয়ে—একবার, দু'বার, তিনবার!

নাগ্ নাগ্ ভান্নমতির খেল!

বাব বাব ~~কর~~ শব্দ শুনে বাটির মতো! আসছে, চান আসছে—প্রাণটি ইন্দ্রিয় উৎকর্ষ করে উঠেছে মনতোষ ভালদাব। শব্দ হচ্ছে—আসছে চান। শব্দ বাটি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সব শব্দে বোমাক দেখা দিয়েছে বাড়করের।

শব্দ শোনছস? আইচ্ছা এতবার খাল বাটির ঢাকা।

মাহগুস্তের মত বাটির ঢাকা খুলল গণেশ।

কই কিছু নাহ? বাটিতে—

নাহি—একটা অস্ত্র আর্তিনাড়ে ভেঙে পড়ে মনতোষ। তবে যে কতছিল জোর আছে মস্তরের...

অত্যাধিক নরক থেকে যেন ভেসে এলো প্রফেসার মনতোষ হালদারের কর্ণধর।



## অরণ্য

গাছ বোকা ছেলেটা। নইলে বসে থাকে কেউ এই বাগারে! পাড়ার পঞ্চানন অবধি চাকরী পেয়ে গেল—বিরাসী টাকা মাইনে। মন্দ কি! ঠেলে হুঁলে ম্যাট্রিক ক্লাস অবধি উঠেছিল। পরেশ তবু নির্বিকার। চাকরী না করিস দাদাকে সাহায্যও তো করতে পারিস; তাও না। স্বদেশী কি আপলোক করে না বাপু! কানে তুলে দিয়ে পিঠে কুণো বেধে বসে আছে পরেশ। বোকা না হাতী, দু'দে সয়তান ছেলেটা। বসে থাবার মতলব আর কি!

ছেলের মত ছেলে যদি কেউ থাকে তো সে হচ্ছে রমেশ। কে বলবে পরেশেরই দাদা ও। আট-এ, বি-এ পাশ না হয় করেনি, কি আসে যায় তাতে। দশজনের একজন রমেশ। এই তো 'সদিন কুইনি'নের ওপর দাও মেরে নগদ একশ' টাকা হবে এনেছে। বি-এ পাশ করে এম-এর দোর অবধি তো ঘুরে এলো—কয় আলু ক না দেখি দশটা টাকা, বুঝি। যে গরু ছুধ দেয় না, তার আবার চাট। বলে আবার ধরিয়ে দেবে রমেশকে, স্ত্রীবিধে পেলেই। কুইনি নিয়ে ছিনিমিনি খেললে গরীবলোক সব মরে যাবে যে! ওরে আমার রামকেষ্টে! চাণাকী বুঝতে বাকি নেই বিনোদিনীর।

এতকাল কোন কথা বলেনি বিষ্ণু বৌদি। ইদানিং মুখ গুলেছে। এখন আর কার তোলাকা করে সে! স্বামী তার রীতিমতো রোজগারে। চাটাং চাটাং করে দেশ ছ'কথা শুনিয়ে।

পরেশ কিন্তু নির্বিকার। বাড়ি আসে, থায় দাম, একটু বিশ্রাম করে কি করে না, আবার বেরিয়ে পড়ে বনের মোষ তাড়াতে। মা বলেন :

তুই কি চিরকালই বসে থাকবি তবে কি জন্ম লেখা পড়া শেখান হোল তোকে?

তাই'লে টাকার জগুই লেখা পড়া শিখিয়েছিলে, বলো, বলে দাও—কাল থেকে আব আসব না।

'আব পারি না তোর সঙ্গে। কি যে কথাবার্তা ছিঁরি।

আপাতত চুপ কবে যান মা। আবার কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রস্তাবটি নিয়ে আক্রমণ করবেন।

আব মালতী, পবেশেব ছোট বোন। মালতীর জগুই এত ভাবনা পরেশেব। কোনদিন দেবে একটা বাটেব মডাব সঙ্গে ঝুলিয়ে বেচাবীকে, তা'বি ষড়ব্দ চলছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি গাধা'র মত খাটায় ময়েটাকে। দুপুরে একটু অবকাশ। পবেশেব ঘবে এসে হাজির হয় মালতী।

নিচেব ঘরটায় ডাম্প, দিনেব বেলায় আলো জ্বালত পা'লেই যেন ভাল হয়। তবু এইটেই পছন্দ পবেশেব, একটু নিরিবিলা।

কি একটা বইয়ে ডুবে ছিলো পরেশ। পায়েব শব্দ শুনলো না।  
আম মালতী

ছেলে মানুষ আছে মালতী এখনও। পবেশেব বই কাগজপত্র নাদানাড়ি করা ওর চাই। পরেশ শুধু একবার সাবধান কবে দেয় : দেখিস্ হাবাসনে বেন কিছু।

নাগো না। একি দাদা, তোমার জামাটা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে, হঠাৎ চোখ পড়ে মালতীর, একটু সেলাই কবে দি। ছু চ্ সুতো আনতে পা বাডায় মালতী।

আব সেলাই কবতে হবে না ডে'পো মেয়ে—আব একটা জামা আছে আমার। সাবাদিন খেটে খুঁটে ছপুর বেলা আবার এলেন উনি সেলাই করতে।

ফিরল মালতী।

বড় খাটুনী গিয়েছে নাবে তোর? এই খান্টায় একটু শুয়ে নে তুই। সন্নেহ কণ্ঠ পরেশের।

সজল হয়ে আসে মালতীর চোখ। লক্ষ্মী মেয়েৰ মত শুয়ে পড়ল সে। মালতীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে পরেশ বল্লে—ইস্ তোর গায়ে কি ঘামাচি হয়েছে।

মা দিনেব পর দিন তিস্ত হয়ে উঠছেন। ছোড়া অন্তপ্রাণ মালতীর। তাই মালতীর ওপরই গিয়ে পড়ে রাগটা।

মর, মর, মরণ হয় না তোর! দিন দিন শিঙ্গি হয়ে উঠছি—আড্ডা দিলেই চলবে?

মান মুখে উঠে যায় মালতী, জবাব দেয় না। শুকভাবে বসে থাকে পবেশ।

নির্বিরোধ ভালো মানুষ ব্রজেনবাবু। কাকুর সাথেও থাকেন না, পাঁচও থাকেন না তিনি। তিবিশ টাকা মাইনেয় মার্চেন্ট অফিসে ঢুকেছিলেন— ছাব্বিশ বছরে বেড়ে পাঁচান্ন টাকায় এসে গম্কে দাড়িয়ে গেছে। পাঁচান্ন টাকা মরুভূমিতে জলবিন্দু, সংসার চলে না। রমেশের ওপর কথা বল্বেন কোন্ সাহসে? মাসান্তে বিনোদিনীর হাতেই তুলে দেন্ টাকাটা।

একি ছুটো টাকা কম কেন? ক্র কুঁচকে প্রশ্ন করে বিনোদিনী। গলার স্বরে পুঞ্জীভূত বিরক্তি।

পরেশ একটা টাকা নিয়ে নিল, আর মালতী ক'টা জিনিস আনতে বলেছিল তাই...আম্তা আম্তা করেন ব্রজেনবাবু।

তা আমি আগেই বুঝেছি। আপনিইতো মাথাগুলো চিবিয়ে থেয়েছেন ওদের। অথচ ওর টাকাপুত্রো অবধি এ চুলোর পিণ্ডি বোগাতেই যায়, একটা পয়সা পর্যন্ত জমাতে পারলো না। গর্জে উঠলো বিনোদিনী।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে হজম করেন তিরস্কাব। বিনোদিনীর কথা অবশ্য সত্য নয়—ব্রজেনবাবু তা জানেন। রমেশের ব্যাঙ্কেব ত্রিগাব তার হাতে পড়েছিল একদিন।

কয়লা নেই। এই নিন টাকা—কাল সকালেই উঠুন ধরবে না।

ছুটাকার একটা নোট ব্রজেন বাবুকে দিয়ে বাকী টাকাটা আঁচলে বাধলো বিনোদিনী! ব্রজেনবাবু বস্তা নিয়ে অফিসের কাপড়েই বেরুলেন কয়লার জোগাড়ে।

পা টিপে টিপে বিনোদিনী এসে ঢুকল পরেশের ঘরে। কিছু আগে বেরিয়ে গেছে পরেশ। এ সময় কোনদিনই থাকে না সে।

মালতী সস্তা দামের সাবান পাউডার নেড়েচেড়ে দেখছে। বাঃ বেশ গন্ধটা। বড্ড ঘামাচি হয়েছে তার। ছোঁ গেরে সাবান পাউডার তুলে নিল বিনোদিনী।

আবিখ্যোতা। সাবান মাখে—বাপ ওর রোজগেরে লাট। জানালা খুলে কি হচ্ছিল শান এই ভর সন্ধ্যাবেলা—পিরীত জমাচ্ছিল বৃষ্টি ওই ছোকরার সঙ্গে।

বৌদি! আর বলতে পারে না মালতী। আবছা অন্ধকারে টম্ টম্ করে জল গড়িয়ে পড়ে ওর চোপ থেকে। ঘামাচিগুলো চুট মুট করে ঝেঁ—বস বস করে চুলকোতে থাকে মালতী।

ব্রজেনবাবু আধমনি বস্তার ভারে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছেন অনেকক্ষণ। পরেশ শুয়ে শুয়ে একটা সাপ্তাহিকের পাতা উল্টোচ্ছে। মচ্ মচ্ করে ছুতোর আওয়াজ হলো—রমেশ এলো।

বিনোদিনী চোখ বুজে পড়ে ছিল। আলো জ্বালতে পাশ ফিরে শুলো। নিচ থেকে একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরেই এসেছে রমেশ। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। তারপর নিজের দিকে আকর্ষণ করলো বিনোদিনীকে।

জেনে আছো?

হঁ—বলে স্নকোশলে নিজেকে মুক্ত করে নিলো বিনোদিনী। ও বাড়ির

বোঁ কি চমৎকার একটা কানপাশা গড়িয়েছে। একটা অপকণ দেহভঙ্গী করে বল্লো বিনোদিনী।

সন্তান হরনি এখনো বিনোদিনীব। অল্পবাব এ বমণাব আকর্ষণ কম নয়। কানপাশাব প্রতিশ্রুতি দিতে হলো বমেশকে।

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ক'দ কেঁদে আনকঙ্গণ ঘুমায় পড়েছে মালতী।

মিলিটারী কনট্রাক্টটা কি দসকে পাবে নাকি? হঠাৎ অসময়ে বাড়ি ফিলে এলো বমেশ। পরেশ তো অবাক। বিনোদিনীব সঙ্গ তাব কি কথা হলো কে জানে। বমেশ ডাকলো—মালতী

কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় সর্চাকত মালতী তব তব বক্ষে এসে দাঁড়ানো বনশেব সামনে।

কথা কিন্তু বললো বিনোদিনী—দাদাব তোমাব গথ হয়েছে বোনকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। নাও চট করে গা ধুয়ে নাও। কাঙ্ক্ষণ সেই সন্তাদামব সাবানটা এগিয়ে দিল বিনোদিনী।

আজ্ঞা পালন কবা অভাস হয়ে গেছে মালতীব। কলতলায় এসে গা উদ্‌গা কবে সাবান মাখতে বাগতে থানিকটা কেঁদে নিলো মালতী। কেমন বেন সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

পরেশ বেরিয়ে যাচ্ছিল। কলতলা থেকে বেবোতেই মুপোমুপি পড়ে গাব মালতী।

কি বল্লো রে দাদা?

সিনেমায় নিয়ে যাবে বলছে।

থবরদার বাসনে। নিশ্চয়ই কোন বদ্ মতলব আছে।

কেন যাবে না গুনি। মা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেবই পায়নি পরেশ।

বলি নিজের তো কোন মুরোদ নেই, অজ্ঞে নিয়ে যেতে চাইলেইও বাদ সাধবি! কি শত্রুই ধরেছিলাম পেটেরে বাবা....

পরেশ তত্তক্ষণ রাস্তায়।

বিনোদিনীর দামী শাড়ি পরে, স্নো পাউডারে সুরভিত হয়ে রমেশের সঙ্গে মালতী সিনেমায় গেল।

ফিরল সেই সাড়ে ন'টার সময় ট্যাক্সি করে। অধৈর্য হয়ে পড়ছিল পরেশ। মোটরের 'আওয়াজ' শুনে দরজা খুলে দিল। নির্জীবের মত নামলো মালতী। এ যেন মালতী নয় আর কেউ। চমকে উঠলো পরেশ।

কি হয়েছে রে তোর?

রমেশ তত্তক্ষণ মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠে গেছে।

কিছু না, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলো মালতী।

মালতীর গলাটা কি একটু কঁপে উঠেছিল? পরেশেরই শোনবার ভুল হয়ত!

আজ আর কিছু খাসনে, শুয়ে পড়গে বা

মালতী বোধ হয় সত্যকথা বললো না। কিন্তু ব্যপারটা কি? সংসারটা কি রকম জটিল অরণ্যের মতো মনে হোক পরেশের।

রাত্ৰিরে কি কেউ ঢুকেছিল তার ঘরে? সকালে উঠে পরেশের আবছা মনে এলো—রাত্ৰিরে কে বেন ঢুকেছিল। কিন্তু কেন? দূর হোক গে ছাই, বোধ হয় স্বপ্ন। উঠে পড়ল পরেশ। আরে এ চিঠি এলো কোথেকে তার বিছানার ওপর? কুড়িয়ে নিল পরেশ, মালতীর লেখা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল চিঠিখানা। রমেশ কাল রাত্রে মালতীকে মোটে সিনেমাতেই নিয়ে যায় নি।

বিবর্ণ মুখে পরেশ আবার পড়ল চিঠিখানা। মালতী লিখেছে:

এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না ছোড়'দা। মরতে তো আমি

চাইনি—বদিও আমি লিখে যাব, এ যুত্বা আমার স্বৈচ্ছাকৃত। তুমি পালাও ছোডদ। ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবাব যড়বস্ত্র করছে। সব ভাল লোককেই ওরা মেরে ফেলবে।

### মালতী

মালতী নেই। মালতী নেই। চোখ ছাপিয়ে জল এলো পরেশের। বাস্প-রুদ্ধ কণ্ঠে আত্মগত ভাবে সে শুধু বললো—এ তুই কি করলি মালতী—এ তুই কি করলি! পরেশ ইচ্ছে করলেই তো বাচাতে পারতো মালতীকে। তখন যদি সে ভাল করে জেগে উঠতো। এতো জলেব দাগ—রোদেই শুকিয়ে যেত। এ তুই কি করলি।

পরেশের প্রায় জন ফুরিয়েছে এ বাড়িতে। বাড়ির অপদার্থ ছেলেটা তার সামান্য বই কটা গুটিকেশে পুরে বেরিয়ে পড়ল সবাব অলক্ষ্যে। বাড়িতে তখন ইউগোল শুক হয়ে গিয়েছে। মা-ব চিংকার শুনতে পাচ্ছে পরেশ। একবার দেখে যাবে নাকি মালতীকে। না পরেশ তা পারবে না। হয়ত গলায় দড়ি দিয়েছে মালতী। চোখ দুটো হয়ত ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে মুখটা, জিবটা হয়ত বেরিয়ে এসেছে, শেষ মুহূর্তে হয়ত বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ওর সমস্ত শরীর হয়ত বৈকে গেছে সে চেষ্টায়। গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে সব। না, মালতীই এমুর্তি সে দেখতে পারবে না।

শিউরে উঠলো পরেশ।

ব্রজেনবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন—অফিসে যাওয়া আজ আর হবে না। রমেশকে বেরফেই হনো, আজ তাব কনট্রাক্ট পাকা হবে।

## মুহূর্ত

ধড়ফড় কবে উঠে বসলো মলিনা। কি ঘুমেরই যে তাকে পেয়েছিল। নীলচে ঘান আলোয় সমস্ত ঘবটা ভবে গিয়েছে। কত বেলা হল কে জানে! মা উঠে পড়েছেন হয়তো। গবমে আর ছাবপোকাকার কামড়ে অনেক রাত অবধি ঘুম হয়নি তার। ঘুমের জড়িমা লেগে রয়েছে এখনও। চোখ রগড়াতে রগড়াতে চারদিকে একবার তাকালো। না, ইন্দুমতী এখনও শুয়েই আছেন যাক বাঁচা গেল! একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মলিনা। ট্রামের শব্দও ত'শোনা যাচ্ছে না; তা'হলে বেলা বেশি হয়নি এখনও। একটা আড়মোড়া ভাঙলো মলিনা। তারপর বিস্রম্ব বসন ঠিক কবতে করতে উঠে পড়ল সে। এখনি আবার ঘান সেবে নিতে হবে, নইলে কল পাবাব আব যো আছে।

একটু বাদেই সমস্ত বাড়িটা জেগে উঠবে—স্বপ্ন হবে একটা ক্লক্ষেত্র। গতীর ঠাকুমা কর্কশ পক্ষ্ম কণ্ঠে অনবরত চিংকার কববেন—নর্দমা ছুঁয়ে দিল, এঁটোকাটা দিয়ে সংসার রসাতলে দিল। ইন্দুমতীই কি কিছু কম ঘান নাকি! ঐ তো শবীর, তুথানা হাড়। কিন্তু গলাব কি অসন্তব জোব!

গামছাটা কাঁধে ফেলে—চুলে তেল মাখতে মাখতে একতলায় নেমে এলো মলিনা! বাথরুম তো নয়, একটা গুহসন! ছেঁড়াচট্ট দিয়ে কোন বকমে বিরে নেওয়া হয়েছে, ওপবটা ত খোলাই। আকবক্ষী হয় না, ঠাট বজায় থাকে মাত্র। কাপড় ভেজান চলবে না, তুথানা মাত্র কাপড় মলিনার। একথানা আবার কলেজে বাবার জন্তে—বাড়িতে ব্যবচাব কবা চলবেনা। হলুদের ছাপ মাথা কাপড়ে তো আর কলেজে যাওয়া চলে না। স্ততরাং বে-আক্ব বাথরুমে গামছাই পরতে হ'লো মলিনাকে। গায়ে জল ঢালতে ঢালতে অভ্যাস বশেই তাকাল উপরের দিকে। অবিনাশ বাবুর বয়্যাটে ছেলোটা জানলাব সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক দাঁতন করছে। সস্ত্র হয়ে উঠলো মলিনা—থাটো গামছাটাকে বুকের



উপর ভালো করে জড়াবার বার্থে ঠাণ্ডা করল একবার। মাথা নিচু করে গড় গড় করে ছ'ঘটি জল ঢেলে তাড়াতাড়ি স্নান পর্ব শেষ করলো সে। তারপর কোন রকমে কাপড় বদলে বেরিয়ে এলো মলিনা।

এই যে নবাব পুত্রীর স্নান হ'লো? আর একটু পরেই কলেজে যেও। বাড়ির কাজ করবে কেন?—মা বাদীতো আছেই! কি শত্রুরই যে পেটে ধরেছিলাম! সম্বজাগ্রতা ইন্দুমতী অভ্যর্থনা করলেন মলিনাকে। এই ত সচনা। কোন উত্তর না দিয়ে সে উঠে এলো উপরে।

সতীশবাবুও উঠে পড়েছেন—দাঁতন করতে করতেই বাজারে যাত্রা করেছেন। ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পরতে হবে তাকে—নইলে আবার ট্রামে চড়তে পারবেন না।

গাম্ছাটা শুষ্ক হাতে দিয়ে ঘানিতে জুতে গেল মলিনা। রান্নাঘর, মানে বারান্দা পরিকাব করলো; উছন ধরালো। ততক্ষণে ইন্দুমতীও স্নান সেরে এসেছেন, ভিজ গাম্ছা পরে লক্ষ্মীর পাট নিয়ে বসেছেন। এই কাজটা তিনি প্রত্যেক দিন নিজের হাতেই করেন। যুবতী কুমারী মেয়েদের নাকি ঠাকুর দেবতা ছুঁতে নেই। বেঁচে গেছে মলিনা। না হ'লে এটাও ওর ঘাড়েই পড়তো।

ভালো লাগে না মলিনার, কিছু ভালো লাগে না। উদয়াস্ত পরিশ্রম, সবু এই গঞ্জনা সহ হয় না তার। বাবা অবশ্য কিছু বলেন না। কোন ব্যাপারে কিছু না বলাই তাঁর স্বভাব। তবে মাসে মাসে কলেজের মাইনে সতীশ বাবু ঠিকই দিয়ে দেন। শত অভাব সত্ত্বেও এ সম্পর্কে তার মুখে কোন অভিযোগ কোনদিন শোনেনি মলিনা! বাবা যদি ওর পক্ষ সমর্থন করতেন...! তাড়াতাড়ি করে মলিনা। এ পাটটা শেষ করতে পারলে বইগুলো একটু উন্টে নেবে। কদিন তো আর ওকর্ম করা হয়নি। এমনি চললে যে কি করে পাশ করবে সে! উল্লনের আঙুন এতক্ষণে গনগনে হয়ে উঠেছে—ভাত চড়িয়ে দিল মলিনা। ইন্দুমতীই নামিয়ে নেবেন। স্নতরাং এবার তার অবকাশ।

কি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন! এতবড় মেয়েকে দিয়ে যদি কোন একটা উপকার হয়। পই পই করে বারণ করেছিলাম দিও না কলেজে। কে শোনে আমার কথা! দেখবো কোন লাটসাহেবের বাড়িতে বিয়ে হয়। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন ইন্দুমতী। চোখ ফেটে জল আসে মলিনার—কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে উদগত অশ্রু রোধ করে সে। চোখে জল দেখলে কি আর আস্ত রাখবেন ইন্দুমতী! অতদিন হলে মলিনা আবার রান্না ঘরেই ফিরে যেত। আজ সে চলেই এলো। বই নিয়ে বসলো ঘরে এসে। পাশ তাকে করতেই হবে! সে তো জানে কত কষ্ট করে বাবা মাসে মাসে মাইনের ছ'টা টাকা গুণে আসছেন।

কিন্তু পড়বে কার সাধ্য! গীতার ঠাকুর মা চাঁৎকার শুরু করে দিয়েছেন, ছুঁয়ে দিলি ত হতভাগা ছেলে কোথাকার! এই মাত্র স্বান করে বেরিয়েছি—কি নরক, কি নরক! এক রকম দোড়ে এসে দাঁড়ায় নন্দ, কাচুমাচু মুখ করে মলিনার গা বেঁধে।

কি, কুকর্ম করে এয়েছো তো, দুষ্টুছেলে! সন্নেহে বলে মলিনা। উত্তরে নন্দ মুখ লুকায় মলিনার কোলে।

বীরুর ছোট ভাই নন্দ। বীরু ছেলেটিকে বেশ লাগে মলিনার। কত আর বয়স হবে—বিশ্র পড়ে। বীরুর মা রাধারানী আরও ভালো। নন্দকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছেন তিনি। স্বামীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের স্বল্প পুঁজিতে সংসার চলে। অভাবের সংসার। তবু মুখে হাসি লেগেই আছে। রাধারানী সত্যিই মা। ছ'বছর আগে ইন্দুমতীও তো এ রকম ছিলেন না। ছ'টো বছরে কি যে হলো। যুদ্ধ—ভূভিক্ষ—সব কি রকম ওলট-পালট হয়ে গেল। ৪২ সালের আগষ্ট মাসে দাদা মারা গেলেন পুলিশের গুলিতে। তারপর অভাব অনটনে কি রকম হয়ে গেলেন ইন্দুমতী। সে দৃশ্য মনে হ'লে এখনও শিউরে ওঠে মলিনা—কত রক্ত! সমস্ত জামাটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল দাদার।

রয়েনকে দিয়ে কত আশা করেছিল সবাই। সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তী

ছাত্র। রমেন, মলিনার দাদা রমেন—মলিনা রমেনকে ভুলতে পারে না! কত আশা ছিল রমেনের—এবারে হেস্ট নেশ্ট একটা কিছু হবেই। হাসপাতালে অন্তিম শয্যায়ও তার মুখে ফুটে উঠেছিল তৃপ্তির হাসি। কিন্তু কই, কি আর হোল?

মরবে বীরটাও। রমেনের মতই হসেছে সে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—সারাদিন টোটো কবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি যে এত কাজ কে জানে! যেন ওকে না হ'লে দেশ রসাতলে যেত! কোথায় কোন লঙ্গরখানা খোলা হবে—ছুটলো বীর। কোথায় কোন বস্ত্র পরিকার করা হবে—বীর গিয়ে ঠিক জুটেবে। ছোকরা মরবে শাগ্গীরই।

তবু বেশ ছেলে এই বীর। বস্ত্রক্ষণ বাড়ি থাকে সমস্ত বাড়িকে মাতিয়ে রাখে। বাথরুম থেকে বেরুলো গানের আওয়াজ আসছে। বীর তা'হলে বেরোয়নি এখনও।...কুঠী, সংকোচ কিছু যেন নেই ছেলেটার। এই ত সে দিন—মলিনা ফিরছিল কলেজ থেকে। বীর আর একটা মেয়ে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল কোথায়। দৃশ্টা মোটেই ভালো লাগেনি মলিনাব। বীর কিন্তু সহজ ভাবে এসে চেপে ধরেছিল মলিনার হাতখানা:

এই যে মলিনা বাড়ি ফিরচো? তোমার সংগে অনেকদিন কথা বলবো বলবো মনে করছি। কিন্তু আবার কে কি বলে তাই আর বলা হয়ে ওঠে না। চলো হাঁটতে হাঁটতে ক'টা কথা বলে নি।

সম্মতির জন্ত অপেক্ষা করে না, বীর হাটতে আরম্ভ কবে। অগত্যা মলিনাকেও যেতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

রমেনদার বোন তুমি, তোমাব ত' চুপ করে থাকা সাজে না। কিছু কিছু, মানে বতটা সম্ভব তোমার পক্ষে, আমাদের কাজে সাহায্য করতে হবে। মগিদি তোমার সংগে কলেজে কথা বলবে, কেমন?

মাথা নেড়ে সাই দিয়েছিল মলিনা। বীরের হাতের মধ্যে মলিনার হাত কেঁপে উঠেছিল একবার? বেশ লাগে বীরকে মলিনাব! পাশের বাড়ির বাড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজার শব্দে সম্মিত ফিরে পেলো মলিনা।

দশটা বেজে গেল। আজ ক্লাশ নষ্টই হবে তার। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, যে বাবা কখন খেয়ে অফিসে চলে গেছেন, নস্ট কখন চলে গেছে—কিছু টেব পায়নি সে। সামনে থোলা বইটার পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছে—এক লাইনও পড়া হয়নি।

মা ভাত বাড়ো। কলেজের বেলা হয়ে গেছে। একতলা থেকেই চীৎকার করতে আরম্ভ করে বীর। চার-পাঁচটা সিঁড়ি এক একবারে টপ্কে ওঠে সে।

মলিনা ও উঠে পড়ে। চাবটি ভাত নাকে মুখে গুজে নেয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে তবু...প্রথম ক্লাশটা নষ্ট হবেই। সিঁড়িতে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—বীকও চলে গেল।...বেরুতে গিয়ে হাচকা টান লেগে থম্কে দাডিয়ে গেল মলিনা। তবে কি সে যা ভেবেছে তাই? না, না, তারই ভুল হয়ত! মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলো মলিনা। কিন্তু ফাঁস করে আওয়াজ হোল যে!...ভাবতে পারে না মলিনা—কাপড়ের দিকে ফিরে তাকাতে সাহস হয় না তার। কলেজে যাওয়া আজ হবে না...কলেজে আর যাওয়া হবে না মলিনার। মলিনা এবার সত্যিই কঁদে ফেলো—গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঊষা নোনতা জলের ফোটা।

আগস্ট, ১৯৪২

পুলিস-ক্যাম্পের মধ্যে অস্ত্রের পদে প.যচারী করেন দারোগা অবনীমোহন।  
দৈর্ঘ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তার। কতগুলি বিসর্পণ কুটিল রেখায়  
নিষ্কর মুখটা বীভৎস দেখায়।

ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত পরিদ্রাব মত শাপ্ত দেখায় এলাকাটা। ইতস্তত  
ছড়িয়ে থাকে ধ্বংসস্তুপ—পুড়ে-যাওয়া বর-বাড়ির বিকৃত কাঠামো, ঝলসে যাওয়া  
বাদামী গাছ। বিস্তীর্ণ রিক্ত বানধেস্ত বৃন্দ করে। আল বেয়ে মাছুষের  
পায়ে চলার পথ সাদা হয়ে তকতক করে। একটা বোবা নিঃসঙ্গতায় গম্ভীর  
থাকে গ্রাম-প্রান্তর।

একটা নেড়ী কুকুর এসেছে কোথা থেকে আর চিংকার করছে অকারণ।  
একটা কিছু করা দরকাব। কেন্দ্র থেকে হঠাৎ রিভলবারটা টেনে বার কবেন  
অবনীমোহন। আর অবনীমোহনের লক্ষ্য অব্যর্থ তাই কুকুরটা আর শব্দ  
কববে না কোন দিন।

অপদার্থের দল। দাতে দাত চেপে হঠাৎ বলে ওঠেন অবনীমোহন। বন্দুক  
কেড়ে রেখে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দিতে হয় সবগুলিকে।

কিন্তু ওদেরই বা কি দোষ! কখন কোথা দিয়ে আক্রমণ আসবে অবনী-  
মোহনই কি তা কল্পনা করতে পারেন? বাস্তব অন্ধকারে কখন ক্যাম্প  
আগুন ধবে উঠবে, কখন কোথা দিয়ে একটা বিধাত্ত তীর এসে লুট্টে  
দেবে একজন বন্দকধারী সিপাইকে—কার সাধ্য তা আগে থেকে বলতে পারে?  
আক্রমণের পর অবশ্য বে-পরোয়া গুলি ছোড়া হয় চারিদিকে। কিন্তু গুলি  
নাগল কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল—তাই কি বোঝবার উপায় আছে? মৃতদেহগুলি  
কোথায় লুকিয়ে ফেলে, কোথায় কোন্ ঝোপের মধ্যে পুঁতে রাখে—কে তার  
সন্ধান দেবে?

অস্থির পদে পায়চারী করেন অবনীমোহন। অপদার্থের দল! বেরিয়েছে তো আর পাত্তা নেই। A bunch of cowards! হয়ত অবনীমোহনের চোখের আড়ালে গিয়ে সিদ্ধি ডলছে শালারা!..

বেশ ছিল মানুষগুলো। অবনীমোহনের কড়া শাসনে শিরদাড়া নিচু করে বেড়াত সবাই। মাঠে চাষ দিত, চণ্ডীমণ্ডপে জটলা করতো এলোমেলো ভাবে। তারপর ফসল উঠলে জমিদারবাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো। আবার চাষের সময় এলে একটা অস্থির উৎসাহে হাল নিয়ে মাঠে নেমে যেত ওরা। স্বপ্নের ঞাল বুনতো, শূন্য গোলা মাটি দিয়ে পরিপাটি করে নিকিয়ে দিত মেয়েরা। রাজ্জে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে রূপোর মল, কি নাকছাবি, কি নীল শাড়ীর বায়না ধরতো। আর ম লুৎতলাও প্রতি-শ্রুতি দিতে কাপ্পা করতো না। এমনি একঘেয়ে নিয়মে গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি। এক-এক সময় এই একঘেয়েমী অসহ্য মনে হত অবনীমোহনের।

বৈচিত্রহীন জীবন। একটা ভারী গোছের চুরিও কদাচিৎ যদি বটে, তাকেই ভাগ্য বলতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সর্বসহ বাস্তবিক দল মাথাচাড়া দিল আর আগুন জ্বলে উঠলো। থানা পুড়লো, পোষ্ট অফিস পুড়লো—পাশাপাশি পনের-বিশটি গা থেকে বনেদী সাত্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন চিহ্নগুলি বিলীন হয়ে গেল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর উপর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল কর্ণেল চণ্ডা হাতে। আর তার পর একটা অস্পষ্ট কম্পিত আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা—মুক্ত স্বাধীন। কোন রকমে, একবস্ত্রে পালিয়ে আশ্রয়লা করে-ছিলেন দোদণ্ডপ্রতাপ দারোগা অবনীমোহন।

কেউ বলে দেয়নি, তবু ওরা মনে মনে অল্পশুব করলো এই দিগন্তবিস্তারী ফসলের সোনা, এই মাটি, এই পৃথিবীর অরূপণ আলো-বাতাস এ সব কিছুই ওপরই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বণ্টার পর বণ্টা মাঠের মধ্যে

এসে দাঁড়িয়ে থাকে ঈশান। চোখ জুড়িয়ে যায়। রুগ্ম কঠিন মুখটা যেন অপত্যস্নেহে কোমল হয়ে আসে।

পথ দিয়ে আসছিল রসিক, ঈশানকে অমন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো :

আরে কেও, ঈশান না—অমন মিঃম মেরে দাঁড়িয়ে রইছ কানে ?

দেখতেছি ; কেমন লজ্জিত ভাবে হাসে ঈশান—এই জমি-জমা সব আমাদের হয়ে গেল ; তারপর একটা কল্পিত আবেগে ফেটে পড়ে মানুষটা।

বোচা বোচা মাস ছয়েকের শিশুটাকে মাই দিতে দিতে স্বপ্নালু ভাবে তাকিয়ে থাকে রাধা। ঐ উধাও মাঠের ওপর দিয়ে একদিন এ গাঁয়ে এসেছিল রাধা।

অল্প কিছু জমি-জমা ছিল, আর ছিল শক্ত সবল বাহ ঈশানের। স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল ওদেব জীবনে—ঈশানের রুগ্ম কঠিন মুখে লেগেছিল কেমন একটা পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার ছাপ। একটা অভাব শুধু পীড়া দিত, একটা শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করত ঘরবাড়ি। কত কবচ-মাছলী, কত তুচ্ছতাক—তথ্যে না বাজা ছর্নাঁম ঘুচলো রাধার !

ঘোলাটে হলুদ রঙ লেগেছে ধানের ক্ষেতে—আর স্বপ্নের ছোয়া লেগেছে মানুষগুলার জীবনে।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকার লোক নন অবনীমোহন। ওরা আসছে গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিয়ে। তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ পড়ছে গ্রামে প্রান্তরে।

রুগ্ম নোংরা মানুষগুলো আবার জটলা করলো, তামাক খেলো, কাশল আর চিংকার করলো এলোমেলো ভাবে। তারপর আধ-পাকা ধান কেটে এনে আগুন লাগিয়ে দিল খমখমে গভীর মুখে।

কিছু থুয়ে ঘাব আটকুড়ের বেটাদের জন্তু—মুখে ছাই স্মৃষ্টিদের।

ধানের স্তুপ সামনে নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে ঈশান।

বসে আছিস বে, আগুন দে—এসে পড়বে যে ওয়ারা।

তারপর ঈশানের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে নিজের আগুন লাগিয়ে দিল রাধা।

বা, পুড়ে গেল!

একটা ফাটা আতনাদের মত শোনাগ ঈশানের কণ্ঠস্বর। পুড়ে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওদের সব্ব-লালিত স্বপ্ন-সম্ভাবনা। আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকল ভস্মস্তুপ।

তারপর সুর হস্ত হিংস্র স্বাপদের মগ্ন্য-শিকাব। পরিত্যক্ত ঘর-বাড়িতে আগুন জলে, শেষে মানুষ খুঁজে না পেয়ে গুলি ঢালাতে থাকে ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে।

একটা গুলি এসে লেগেছিল রাধার কোণের ছেলেটাব পিঠে। ঝোপের কালো কালো স্তর মুখগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই— শুধু হাতে ত বন্দকের মহড়া নেওয়া যায় না!

কুকুরগুলো—দাতে দাত চেপে পিছন থেকে কে একজন বলে ওঠে।

আর চারিদিকের আবহাওয়াটা কেমন অপ্রাকৃত হয়ে থমথম করে। অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে দরের পুলিশ-ক্যাম্পের আলোগুলো মিটমিট করে জোনাকীর মত। জনমানবহীন ভূতুড়ে গা একটা দম-আটকে-আসা নিস্তব্ধতা মুচ্ছিত হয়ে থাকে।

দূরে ভারী বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—ফিরে আসছে টহলদারবাহিনী।

হাজার এক আদমী কোঁ পাকাড় লাতা—

দূর থেকে একটা লোককে হিচড়ে টেনে আনতে দেখে সসংবাদটা বড়-বাবুকে না জানিয়ে থাকতে পারে না ক্যাম্পের পাহারাদার সিপাই।



কিন্তু আসামী একটা বোকা-বোকা চাষী মেয়ে। হাবিলদার জানাল, পা টিপে-টিপে ক্যাম্পের দিকে আসছিল মেয়েটা। হাতে ছিল কেরাসিনে ভেজান ছাকড়া আর দেশলাই।

হুঃ, কি করতে আসছিলি এদিকে? হাবিলদার অবধি ভয় খেয়ে যায় এমন ভাবে হংকার দিয়ে উঠলেন অবনীমোহন।

আগুন দিবার চাইছিলাম ক্যাম্পে... আর—শাস্তি অবিচল ভাবে জবাব দিল মেয়েটা।

আগুন দিবার চাইছিলাম • হঠাৎ বেন সব বক্ত্র মাথার চড়ে যেতে চাচ্ছে অবনীমোহনের। গুলি করে ওর ঐ নোংরা গুলিটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলেও উদ্ধত ক্রোধ চেপে জিজ্ঞাসা করলেন : কি নাম তোর?

বাধা

বাধা ' ভেংচে উঠলেন অবনীমোহন, কেছবা সব কোথায় গেল তোর?

হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে হাবিলদারটা। বড়বাবু রসিকতা উপভোগ করেছে সে।

চোপ বগ শালা বাধা কুকুরের মত হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠেন অবনীমোহন। তারপর মেয়েটার হাত মুচড়ে ধরেন অবনীমোহন।

গায়ের লোক সব কোথায় গেছে?

জানি না

জানি না—তুমি কবে একটা চড় পড়ল মেয়েটাব মুখে। এবার চোখে কয়েক ফোঁটা জল দেখা গেল মেয়েটাব—আশাবিস্ত হ'লেন অবনীমোহন।

কোথায় গেছে লোক সব?

জানি না

বলবি না তুই—দে তো শালাকে উলঙ্গ কবে

মেয়েছেলে ছজ্ব—পেছন থেকে কে একজন একটা ক্ষীণ মন্তব্য করে।

দয়ার অবতারণাটিকে—এদিকে নিয়ে আয় তো বেটা'কে। শালা কতদিন ঢুকেছে পুলিশ লাইনে?

হ'হাতে কাপড়টা চেপে রাখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করলো মেয়েটা।

নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে অবনীমোহনের। উদ্রলোক হলে কথা ছিল না—একটা সামান্য চাবীমেয়ে। একটা কিছু করা দরকার—খুন চড়ে যাচ্ছে অবনীমোহনের।

বলবি না? এই হাবিলদার ইস্‌কো বাহার লে যাও—সওয়াল করো

জঙ্গলের মধ্যে কঠিন মুখে বসেছিল ওরা। শেষে এক সময় গিরে রক্তাক্ত নগ্ন মৃতদেহটা টেনে নিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে ত্রস্ত নিঃশব্দে মা আর ছেলেকে পুঁতে রাখল একসঙ্গে। একটু মাটি উঁচু করে রাখল—স্মারক চিহ্ন।

পিত্তবিধান হবে এয়ার—হবে, হবে—আনাড়ীর মত কে এক জন সাস্থনা দিল।

নিরর্থক একটা বিনিদ্র রাত কাটল অবনীমোহনের।

এই শালা উল্লু! হঠাৎ ক্রুদ্ধ হংকারে চমকে ওঠে হাবিলদারটা। আপনা কোম্পানী লে'কর তামাম জঙ্গল ঢুড়কে দেখো।

বোকা বোকা মুখ করে বেরিয়ে যায় হাবিলদার। বাইরে ভারী বুটের সার দিয়ে দাড়ানোর আওয়াজ পাওয়া যায়—টেনশন।

তারপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শশস্ত্র দলটা।

## কানাগলি

জব চার্নকের উপনিবেশ এগিয়ে গেছে, উত্তরে টালা আব দক্ষিণে টালিগঞ্জ পেরিয়ে। ঝলমলে মায়াময় একটা দেশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর কলকাতা।

চৌরঙ্গী আর বালিগঞ্জের ঠিকজাল্যর আশেপাশে ধোঁয়া, কালি আর বন্ধ হাওয়ার আলো-ছায়ায় বিচিত্র ল্যাণ্ডস্কেপ। কতটুকুই বা রাস্তা; ট্রামের শব্দ শোনা যায়, লরীর চাকায় বৃদ্ধ হাঁপানিগ্রস্তের পাজরার মত কেঁপে ওঠে ইট বের করা বাড়িগুলো। রেডিও মারফৎ চাঁদের দেশের হাতছানিও এসে পৌঁছায়। ছোট একটা কানাগলির ব্যবধান, তবু মনে হয় অনেক দূর।

গলিটা কর্পোরেশনের নয়—তাই আলো নেই, ময়লাও পরিষ্কার করা হয় না। সন্ধ্যার আগেই ধোঁয়া আর পুতিগন্ধে নেমে আসে অন্ধকার। ময়লা বাচিয়ে কোন রকমে হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়িতে এসে ঢোকে শিবুর বাবা।

ছোট দোতারা বাড়ি। চূণবালি খসা বাড়িগুলো বড় রাস্তার ঝুঁকুকে প্রাসাদকে ঈর্ষায় ভেংচি কাটে। শিবুর বাবাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হয় কয়েক মিনিট—কল্লু কাপড় ছাডচে। এক ঝামেলা। বাথরুম নেই। গৃহিনী নন্দরাণীর অবশ্য আর আবকর প্রয়োজন হয় না। ত্রিশোধের পাসপোর্ট মিলে গেছে, তাই তার বসনের কার্পাসটা সর্বদাই চোখে পড়ে।

একটু তাড়াতাড়ি কর বাপু! ভালো লাগে না খেটে খুটে এসে... তাড়া দেয় শিবুর বাবা।

নন্দরাণী ততক্ষণে উঠুন ধরাবার প্রচেষ্টায় শ্রাংসেতে একতলাটা অন্ধকার করে তুলেছে। চোখ জ্বালা করে শিবুর বাবার। তার একবার তাড়া দেবার আগেই বেরিয়ে আসে ঝুঁকু।

এই একথানা তিনদিক বন্ধ ঘরেই নন্দরাণীর সংসার। এ বাড়ির আভিজাত্যের স্তরভেদ আছে। দোতলার ভাড়াটে অবিনাশবাবু আর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মনোরমা ভিন্ন জগতের মানুষ। সুবিধে পেলেই উঠে যাবে অল্প জায়গায়।

দোতলার অপর অংশে থাকে বিজয়—বাড়িওয়ালা। বাড়ির মালিক নয়—সমস্ত বাড়িপানাই ভাড়া নিয়েছে সে। আগে নিজের ভাড়াটা উঠে যেত—এখন ঘরেও আসে ছ’পয়সা।

অফিস থেকে ফিরে ময়লা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে নির্জীবের মত চোপ বৃজে শুয়ে পড়ে শিব্ব বাবা। অর্ধেক মাইনে এ্যাডভান্স চেয়েছিলেন—পাওয়া যায়নি। বিজয় একুনি অ’সবে ভাড়ার জন্ম।

ত্রিশের এদিকেই বয়েস বিজয়ের, বিপরীক, বিধবা বোন সড়র বাড়়েই সংসার। সেই সড় গেছে স্বস্তুর বাড়ি। স্বস্তুর মৃত্যুশয্যায়—যদি কিছু দিয়ে যায়! দেবে তো কাঁচকলা। এদিকে ভোগান্তির শেষ নেই। উত্তন ধ্বাত্তে গলদখর্ম হয়ে ওঠে বিজয়। ‘কা তব কান্তা’ বলে বিবাগী হয়ে যেতে উচ্ছে করে।

যাত’ মা, বাটি মেপে একবাটি তেল নিয়ে আয়তো ওপবেল ওই ওদের কাছ থেকে—কন্নুর হাতে একটা বাটি দিয়ে বলেন নন্দরাণী। দ্বিধা করে লাভ নেই—সিঁড়ি বেয়ে ওঠে কন্নু।

অবিনাশ বাবু বাড়ি নেই। সাক্ষ্য প্রমাণনে শিপিল দেহভার ওঠা-বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মনোরমার। দাড়িয়ে থাকতে পিস্ত্রী লাগে, উজ্জ্বলিত্তি ভালো লাগে না কন্নুর।

কিন্তু মনোরমারই বা দোষ কি? অবিনাশ বাবু কত ঘুরে চোরাবাজার থেকে সংগ্রহ করে আনেন এই বানিভাড়া সরষের তেলটুকু। নন্দরাণী অবশ্য বাটি মেপে তেলটুকু ফেরত দেয়—কিন্তু সে সস্তাদামের ভেজাল কন্টেইনের তেল। তবু মনোরমাকে উঠতে হয়। নেই বললে নন্দরাণী নিজে এসে

ভাজির হবে, বোতল শিশি বাঁটাবাঁটি কববে। বেলা ধরে গেছে মনোরমার।  
অবিনাশ বাবুকে বলে বলে হৃদ হয়ে গোছ—তব বাড়ি বদলাবার নাম  
নেই।

‘ধৃতোর’ বলে উঠে পড়ল বিজয়। হোটেল থেকেই চালিয়ে নেবে আজ।  
শিবুর বাবাব কাছ থেকে ভাড়াটা বরং আদায় হবে নিয়ে আসা বেতে  
পারে।

বিজয়কে দেখে জডসডভানে সিঁড়ির একপাশে সবে গেল কল্লু।

এই যে, বাবা আছেন তোমার? নামতে নামতে হিজ্জাসা করে  
বিজয়।

মাথাটা একটু কাত করে উত্তর দিল কল্লু।

সিঁড়ির এ জায়গা থেকে ই কপকধার রাজপুত্রীর একাংশ দেখা যায়।  
নিপ্পাপ, নিশ্চুপ, মনে হয় জনমানবহীন। কিন্তু সে তো মোহ মাত্র।  
জানলাব ফাঁকে ফাঁকে উজ্জল শাড়ীর ঝিলিমিলি দেখা যায়—পিয়ানোর ছ’একটা  
ছিন্ন টুং টাং ভেসে আসে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে  
কল্লুর।

টাকা পেলে?

নন্দবাণীব প্রণের জবাবে চোখ বুজেই মাথা নাড়েন শিবুর বাবা।

বিজয়, তা এসো বাবা—ধৃতোর শপে যুগ না তুলেই বলেন নন্দবাণী।  
বান্না বান্না হোল? কি বাঁধনো?

সে আর বলেন কেন মাসিমা উল্লুনিই ধরলো না। ও হোটেল  
থেকেই চালিয়ে নেব

সে কি বাবা, তাও কখনো হয়। আমবা আছি কি জন্তে! তা  
তোমার যদি আমাদের ধরে খেতে লজ্জাই করে—কল্লুই না হয় চারটি রেঁধে  
দিয়ে আসবে।

না না কি দরকার...একটা কণী প্রতিবাদ করে বিজয়।

না, না লজ্জার কি আছে? তুমি যাও আমি একুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি রুহকে।

অগত্যা ভাড়ার কথা আর বলা হয় না বিজয়ের।

রুহুর বসবার ভঙ্গী মনোরম। অবিনাশবাবু ফিরে এসেছেন। ওদের ঘর থেকে বিশ্রামাল পের হু'এক টুকরো ভেসে আসে। রুহুর বাহুস্পর্শে উল্লুন ধরে গেছে। অনেক দিন পরে বিগত পত্নীর কথা মনে পড়ে। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়—রুহুর পিছনে এসে দাঁড়ায় বিজয়। শীতের মধ্যেও বেমে ওঠে রুহু।

রাত নাটার সময় ফিরে এল শিবু।

কিছু হোল? চোখ খুলে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে শিবুর বাবা।

না। হতাশায় মাথা নাড়ে শিবু, লোক সব ছাড়িয়ে দিচ্ছে

বিছানায় শুয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে রুহুর। ততক্ষণে অবিনাশ বাবুর কাছ থেকে নতুন শাড়ীর প্রতিশ্রুতি আদায় করে ফেলেছে মনোরমা। মনোরমার দূত কোমল বক্ষে স্বর্গস্থত অনুভব করেন অবিনাশবাবু।

শিবু আর সব বিলাসিতাই একে একে বর্জন করেছে, পারেনি শুধু একটি—সিগারেট। নেশাটা ওকে পেয়ে বসেছে। তবু অনেকটা সংযম অভ্যাস হয়েছে বৈকি। কলেজি জীবনে দিনে দু'প্যাকেটের কমে চলতো না—এখন চারটে জুটলেই নিজেকে সোভাগ্যবান মনে করে শিবু। চা-টা বাড়িতেই পাওয়া যায়—না হলে এটিও ছাড়তে হোত। কিন্তু সিগারেট ছাড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না শিবু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ছাড়তেই হয়। বেকারের আবার নেশা। উজ্জ্বলি আর কতদিন চলে!

বাবার সঙ্গে সম্বন্ধটা চিরকালই কম শিবুর। আর মাও এবার স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, আর এক পর্যাও তিনি দেবেন না। যে ছেলে এই যুকের

বাজারেও একটা চাকরী জোগাড় করতে পারেনি তার আবার পয়সার কি প্রয়োজন! সত্যি তো, যে গরু ছধ দেয় না গোম্বালে আর কে তাকে আদব করে পোষে! তবু একবার বাজিয়ে দেখতে ছাড়েনি শিবু। মেয়ে মানুষ হয়েও মা যাকে বলে একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন।

অগত্যা শরণ নিতে হয় ভাই বোনদের।

একটা টাকা ধার দিতে পারিস রুমু? চাকরীটা হলেই শোধ করে দেব।

সঙ্কিত তহবিল থেকে একটা টাকা বার করে দেয় রুমু। ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি না থাকলেও দিত। সিগারেট না পেলে যা অবস্থা হয় শিবুর সহ করতে পারেনা রুমু। সারাদিন ফ্যা ফ্যা বরে ঘুরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসে শিবু। বেখানাই থাক ছুটে আসবে রুমু। হাওয়া করবে; তারপর উদগ্র আশায় প্রশ্ন করবে—কিছু হোল দাদা?

না, হোল আর কই! হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে শিবু। তারপর আবার একটু আশা দেয় রুমুকে; বোধ হয় নিজেকেও।—একটা ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম; হয়ে যাবে বোধহয় এবার।

মিথ্যা আশ্বাস—তা রুমুও জানে, শিবুও জানে। তবু হু'জনেরই বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে হয়, তাই যেন হয় ভগবান, তাই যেন হয়।

কিন্তু চাকরীটা হলে তুই কি নিবি বলতো রুমু? আর অজু তুই কি নিবি?

রুমু কিছু বলল না, অজু বলে—আমি একটা ফুটবল নেব দাদা; ওই ওদের বাড়ির ছেলের মত বড় ফুটবল।

রূপকণার রাজপুত্রী দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয় অজু। তারপর আবার কি ভেবে বলে—আমার একটা টাকা আছে নেবে দাদা? হয়ত টাকা ঘুষ দিয়ে ফুটবলের প্রতিশ্রুতিটা পাশা করে রাখতে চায় অজু।

কি জানি কেন হঠাৎ কান্না পায় শিবুর। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—এখন থাক দরকার হলে নেব।

কি খেয়ে দেখে উদ্ধার করতে হবে, না বসে বসে আড্ডা দিলেই চলবে? পারিনে বাপু, খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়ে গেল।

নন্দরাণীর নোটস এসে গেছে। উঠে পড়ে শিবু—রুম্মুর কথা আর শোনা হয় না।

শিবুদের ঘরে বিজয়ের আনাগোনা বেড়ে গেছে আজকাল। সড়কেও তাড়া দিয়ে চিঠি লেখে না আর—ঘীরে স্নেহে মরুক সড়র শ্বশুরটা। একেবারে একটা বন্দোবস্ত করেই আসুক সড়।

পচ্ছন্দ হয়না শিবুর এসব। কিন্তু কে শোনে তার কথা! বেকারের আবার মতামত! তবু শিবুও বিজয়ের দাদার পদে উন্নীত হয়ে গেছে—যদিও বয়সে সে বিজয়ের ছোটই হবে। আপায়নের ক্রটি করে না বিজয়।—হেঁ হেঁ শিবুদা, হোল কিছু? হবে না তা জানিই—অতি সাধু হলে হয় না কিছু এ বাজারে। আমার সঙ্গে চলুন ছ’দিন, ঘরে পয়সা আসে কিনা দেখবেন।

কষ্ট করে আবার একটু হাসে—একটা দামী রসিকতা করে ফেলেছে বিজয়।

যুধি মেরে বিজয়ের ঐ পান খাওয়া দাঁতগুলো উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে শিবুর। কিন্তু তা তো আর হবার উপায় নেই। বাড়ি ভাড়ার তাগাদা তো করেই না বরং মাঝে মাঝে বাজারটাও নিজের পরসায় করে এনে দেয় বিজয়।

তবু রুম্মুকে বলেছে শিবু—তোর কি দরকার বিজয়বাবুর রান্না করে দেবার?

কিন্তু রুম্মু কি করবে? নন্দরাণীর জিভের ধার তো শিবুরও জানা আছে। কানাগলিটা চারিদিক থেকে ছোট হয়ে আসছে—সংকুচিত হয়ে আসছে পুতুল



নাচের আসর। কি করবে শিবু! বুঝতে পারছে শিবু, ভাঙন ধরেছে ভাঙছে। বঁকে হুমড়ে যাচ্ছে জীবন! কিন্তু কি করে বন্ধ করবে এ ফাটল? একটা চাকরী, একটা চাকরী, চাই তার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা চাকরী। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারে শিবু!

রাত দশটা বেজে গেছে, এখনও ফেরেননি শিবুর বাবা। কি আবার হোল কে জানে? খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে শিবুদের। শিবুর বাবার ভাত ঢাকা আছে, যখন আসেন খাবেন। তার জন্ম ভাতের থালা আগলে বসে থাকবেন নাকি নন্দরাণী। ছাতে এসে একটা সিগারেট ধবাল শিবু।

আর কতক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা যায়। ফিরে এলেন শিবুর বাবা।

দাদা চাকরি গেছে বাবায়! কান্নার মত শোনাল কল্পুর কথা।

কোন কথা জোগায় না শিবুর। তেতো লাগে সিগারেট, বিষ তেতো।  
আধথানা সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয় শিবু।

কানগলিটা নির্জন অন্ধকারে থম্কে থাকে। কপকথার রাজপুরী থেকে ভেসে আসে চাপা হাসি আর আনন্দের ছিন্ন কাকলী।

## চাঁদ

ক্লাইভ স্ট্রীটের আকাশে চাঁদ উঠলো—জ্যামিতিক বৃত্তের মত নিখুঁত গোল চাঁদ। কেমন একটা নিরস্তিরে বোলাটে জোৎস্নার অপ্ৰাকৃত দেখাল বশিকপুরী।

জন-বিরল হয়ে এসেছে এদিকটা—এখন আর ঘন ঘন ট্রাম আসছে না। এ অফিস, সে অফিস কবে সাবাদিন ঘুরেছে অমর, আর পারা যাচ্ছে না। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে কোথাও। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে।

গুণে গুণে ছ’টি পয়সা আছে পকেটে। ছ’পয়সা দামেব একটা সিগারেট ধরিয়ে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে বসবে, না এক কাপ চা খেয়ে হেঁটে যাবে—কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। উদ্বেগহীনভাবে সারা ডালহৌসী স্কোয়ারটাকে একবার চক্কর দিল অমর।

এক কাপ চা খেয়ে নিলে ক্ষিধেটা চাপা পড়ে, কিন্তু তাহলে হাঁটতে হয় পাকা দেড় মাইল পথ। চা খেলে যখন হাঁটতে হয়, তখন ক্ষিধের প্রশ্রুতি বাতিল করে দেওয়াই উচিত। একটা ট্রাম আসছে। এগিয়ে এলো অমর। কিন্তু না, কালীঘাটের ট্রাম।

নোটসের বদলে এক মাসের মাইনে পেয়েছিল—তারপর দেড় মাস হতে চললো বেকার।

বাড়ি ফিরলেই মা এসে দাঁড়াবেন উদগ্র প্রত্যাশা নিয়ে। জিজ্ঞাসা করবেন : কিছ হল ?

বোন গোরীও এসে দাঁড়াবে। দিন দিন ফেপ-কুলে মাগী হয়ে উঠছে মেয়েটা। দেখলেই গা জ্বালা করতে থাকে। গলা টিপে দিতে ইচ্ছে করে এক এক সময়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলা হয় না—কেমন একটা অসহায় গরুর মত চোপ মেলে তাকায়, যে মায়া হয়। ওর চোখ ছ’টো যেন বলতে চায়—আমায় মেরনা দাদা, আমার কোন দোষ নেই। কিন্তু দোষ তো কারো একটা থাকা চাই !

কিন্তু ট্রাম আসছে না। ক্বিধেটা যখন বাতিল করে দেওয়া গেছে, তখন হেটে গেলেই বা কেমন হয়? ক্বিধেটা চমচনিয়ে উঠলে মনে করা যাবে ট্রামে চড়েছি, আর পা টন টন করলে মনে করা যাবে চাঁ খেয়েছি—মনে মনে ভাবল অমর। আর কেমন খুশি হয়ে উঠলো। ভাল বুদ্ধি বাৎলান গেছে। মাএ ছ'টিই পয়সা আছে, আর তা খরচ করা উচিত নয়। মার কাছে আর হাত পাতা চলে না।

কই কিছুইত খেলে না, মিষ্টি কবে অল্পযোগ দিল মিলি।

বারে এত অনেক খেলাম, বিপন্নভাবে বলে স্তব্রত।

খুব খেয়েছ, একখানা সিঙ্গাড়া আর একটা চপের অধেক। এ সব আমার নিজের হাতের তৈরী

তাতো বুঝলাম, কিন্তু আমাব পেটটা তো আগ্নেয়গিরি নয়

আচ্ছা, ঐ সন্দেশটা খাও তাহলে—

কাদ কাদ মুখে অধেকটা সন্দেশ ভেঙে মুখে পুরে দিল স্তব্রত। তারপর এক-টোঁক জল খেয়ে বললো :

তোমার কথাও থাকল, আমার কথাও থাকল—এই অধেকটা খেলাম।

দোহাই তোমার, আব যেন পীড়াপীড়ি কর না। এবারে চল বেরোই।

কোনদিকে যাবে?

চলই না

দাঁড়াও, আসছি

একটা ছন্দোময় ভঙ্গীতে ভেতবে চলে এলো মিলি। লাইফ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, শাড়ীর ভাজগুলো ঠিক করে নিল। ছোট কমালটি দিয়ে আলতো করো মুছে নিল কপালের ওপর জমে ওঠা মুক্তা-শুভ্র স্বেদবিন্দু। তারপর পাউডারের পাকটা মুখে, গলায়, বাড়ে বুলিয়ে নিল একবার। রেডি।

ওদের নিউ মডেলের বৃহৎটা ছুটে চললে এসপ্লানেডের দিকে।

অত্মমনস্কভাবে হাটিতে গিয়ে কার্জন পার্কে এসে পড়েছে অম্বর। সোঁজা বোঁবাজার ধরলে হাঁটুনি বাঁচত। আকাশে চাঁদটাকে দেখাচ্ছে একটা অমলেটের মত। কেমন একটা ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। এক ঝাঁক সাদা মোসুমী ফুল ফুটে আছে একদিকে—বেন ভাল ঝালাম চালের একথালী বুরবুরে ভাত। মনটা কেমন বিধিয়ে উঠছে। ইচ্ছে করছে সযত্নে রচিত সিঙ্কন ফ্লাওয়ারের কেয়ারীগুলো লগুভণ্ড করে দেয়।

কিন্তু ছটা পয়সা বাঁচিয়েই বা কি লাভ। বড় জোর আর একদিন চলবে, সেই মায়ের কাছে ত' হাত পাততেই হবে। চাল ফুরিয়েছে—রেশনও আনতে হবে। সুতরাং টাকা ধার করতেই হবে। অতীন জানে চাকরী গেছে, ওর কাছে ধার পাওয়া যাবে না। বিমল, রমেন, সুরেশও জানে, জানে না একমাত্র সুধাংশু। সুধাংশুর কাছেই হাত পাতা যেতে পারে। এখন সুধাংশুকে পাওয়াও যাবে। জগুবাবুর বাজার—পা চাশিয়ে গেলে আর কতক্ষণ লাগবে। গৌরী সম্পর্কে একটু দুর্বলতা ছিল সুধাংশুর। বললেই হবে—গৌরীর খুব অসুখ। সুধাংশু বিমুখ করবে না নিশ্চয়ই। ছ'পয়সা দিয়ে বরং এক কাপ চা-ই খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ট্রামে গেলে তাড়াতাড়ি সুধাংশুব সঙ্গে কারবারটা মিটিয়ে ফেলে আসবার সময় চা খেয়ে নেওয়া যাবে।

পেটের মধাকার জ্বালাটা এতক্ষণে বেন একটু কম পড়েছে। চাঁদের ওপর এসে পড়েছে সাদা একখণ্ড মেঘ। হাসি পেল অমরের, এ নিয়ে নাকি লোকের কবিতা লেখে। Silly fools।

একরাশ ফুল নিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল মিলি। মুগ্ধহৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সুরত।

কি দেখেছো ?

দেখছি কে বেশি স্নান, ফুলগুলি না মিলিরাণী !

যা কি যে বলো, গালে টোল ফেলে একটা অপক্লপ ভঙ্গীতে হাসল মিলি।  
তারপর চোখ পড়ল আকাশের দিকে। বাঃ কি চমৎকার চাঁদ উঠেছে দেখেছো ?  
সত্যি, অপক্লপ। আমার সেই কবিতা মনে পড়ছে

Tender is the night  
And haply the queen moon is on her throne.

আবেগে বুকে আসা গলায় মিলি বলল—চল রেড রোড ধরে চলে যাই যে  
দিকে খুশি।

লিগুসে ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে একটা পাক খেয়ে ময়দানের রাস্তা ধরল বুইকখানা।

সত্যি অপক্লপ দেখাচ্ছে এসপ্লানেডকে। নীলন গ্যাসের আলোর রচা  
কল্পলোক—মুগ্ধ হওয়া উচিত কিনা এক মুহূর্ত ভাবল অমর। চোখের সামনে  
দিয়ে একটা ট্রাম বেরিয়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটা নারীমূর্তি। সামান্য  
একটা আটপোড়ে শাড়ীতে রামধনু রঙা বিনয়। চলার ভঙ্গীটা কেমন পরিচিত  
মনে হচ্ছে। সবিতা রাম, নীলিমা সাত্তাল না লিলি মিত্র? সেই নাক উঁচু  
মেয়েটা? এগিয়ে আসছে এদিকে লিলি মিত্রই হবে।

কিন্তু এইবার গা ঢাকা দেওয়া দরকার। তখন চাকরী ছিল—লিলি মিত্রের  
নাক উঁচুপনাকে খোঁড়াই কেয়ার করত অমর। অবশ্য ভয়ও নেই বেশি।  
বদলী হওয়ার আগে অবধি একঘরে এক সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করলো, তাই  
কোনদিন কথা বলেনি লিলি—আর আজতো অমর বেকার।

আরে, অমরবাবু'না ?

দেখে ফেলেছে লিলি। পাড়ারগায়ের মেয়ের মত অপ্রতিভ দেখায় অমরকে।

হ্যাঁ এইতো দাঁড়িয়ে আছি ট্রামের জন্ত। তারপর আপনি কোথা থেকে ?

বাড়ি ফিরবো আর কি। অল্প একটু হাসিল লিলি। অপক্লপ দেখাচ্ছে

লিলি মিত্রকে। অমরের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। ব্যাপার কি, লিলি যেন একটু প্রশ্রয় দিতে চাইছে অমরকে। তবে কি ওর সম্পর্কে একটু দুর্বলতা ছিল নাকি লিলি মিত্রের? যদি ওর কাছেই পাঁচটা টাকা ধার চাওয়া যায়?

ট্রাম আসছে না। শ্রামবাজারের ট্রামের জগু দাঁড়িয়ে থাকলে অনবরত ভবানীপুরে ট্রাম আসবে, আর আজ ঠিক উল্টো।

কোন দিকে যাবেন? লিলি জিজ্ঞাসা করলো।

ভবানীপুর

তাহলে তো এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে

লিলি মিত্রের ছবয় দৌর্বল্য সম্পর্কে এতক্ষণে যেন নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। টাকাটা এবার চেয়ে ফেললেই হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করাটা বোধ হয় দৃষ্টিকটু দেখাবে।

একটা ট্রাম আসছে। ট্রামে উঠেই পাড়া যাবে কথাটা।

আমুন, লেডীজ সীটের অর্ধাংশে অমরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান লিলি।

কণ্ঠাস্তর এলে পয়সা বার করতে দেবী করতে হবে—তাহলে ভদ্রতার খাতিরে লিলি নিশ্চয়ই পয়সাটা দিয়ে দেবে। পয়সা কটা বাচানই ভাল, কি জানি যদি ধার না পাওয়া যায়। ভবানীপুর থেকে শ্রামবাজার অধি হাঁটতে হবে তা হলে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ভাল দেখায় না। জ্যোৎস্না নিয়ে খানিকটা কাব্য করা যেতে পারে। তারপর আলাপটা একটু জমে উঠলে কোন এক ফাঁকে টাকার কথাটা পাড়া যাবে।

এক খণ্ড কালো মেঘে অর্ধেকটা চাঁদ ঢাকা পড়েছে।

তারপর কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করল লিলি। কতকাল পরে দেখা হল আপনার সঙ্গে

এইত, কোন রকম, হাসি হাসি ভাব করল অমর।

স্পীডো মিটারেতে চল্লিশ ধরো ধরো—মিলির চূর্ণ কুণ্ডল এসে পড়ছে  
সুত্রের চোখে মুখে। কেমন একটা বিহ্বল সুগন্ধ।

- আজ আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

কি? সুডৌল গ্রীবাটি বাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল মিলি।

ইচ্ছে করছে মরে গিয়ে ম্যাগনোলিয়া হয়ে ফুট উঠি

যাও, কি বে বল

কৃত্রিম ক্রোধে গম্ভীর দেখায় মিলিকে।

কোন রকমেই আলাপ এগোয় না। বাবে বারে থেই হারিয়ে যায়  
কথার। কী একটা বলবে বলে বেন উস্খুস্ করে লিলি মিত্র।

ভারী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে না?

এতক্ষণে ঠিক পথে আসছে আলোচনাটা—পুলকিত হয়ে ওঠে অমর।  
বলে : সত্যি চমৎকাব।

কিন্তু—কেমন ইতস্তত করছে লিলি। ততক্ষণ এলগিন রোড ছাড়িয়ে গেছে।

এইবার টাকার কথাটা বলে ফেলা দরকার মনে মনে ভাবল অমর। কিন্তু এখনও  
কথা শেষ করছে না লিলি। মেয়েগুলোব যে কি এক স্বভাব সাজিয়ে গুছিয়ে ছাড়া  
কোন কথা বলবে না। সোজা কবে বললেই হয়—অমরবাবু আপনাকে আমি ভালবাসি।

আমাদের মত লোকের কাব্য করা সাজে না—ততক্ষণে কিভাবে কথাটা  
বলবে ঠিক করে নিয়েছি লিলি মিত্র, এহ ধরুন মায়ের অস্বথ—অথচ  
৬'মাস চাকুরী নেই আমার...

এই কণ্ঠাষ্ঠার বোথো রোথো। হঠাৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে উঠে পড়ল অমর,  
দেখেছেন কথায় কথায় ষ্টেপেজটা পেরিয়ে এসেছি

রাস্তায় নেমে হাফ ছেড়ে বাচল অমর। আর একটু হলেই টাকা ধার চেয়ে  
ফেলেছিল মেয়েটা। সুধাংশুর বাড়ি যেতে এখনো হাটতে হবে, কিছুটা তা হোক।

আকাশে আধবোজা চাঁদ ভেঁচি কাটল।

## রক্ত

বাতাসে খবর এলো, স্নর হয়ে গেছে।

মুহূর্তে থম্কে গেল এলাকাটা। একজন এসে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলো :

কি হয়েছে দাদা ?

লেগে গেছে, আবার কি !

কোথায় ?

এইবার বিব্রত বোধ করেন ভদ্রলোক - কোথায় হয় জানেন না বুঝি ?

লোক জমছে, জটলা হচ্ছে—বাতাসে খবর এসেছে, স্নর হয়ে গেছে !

লেবা বাবু ছ' আনা—যা লিবে তা ছ' আনা !

অস্বস্তির ভাবটা কাটাবার জ্ঞাত একবার বলে উঠলো ইরশাদ।

না, কাজ ভাল হ'লো না ! না ভালো হলো না !

নিশ্চিন্ত মনে যে ভদ্রলোক এই ক'দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন বাড়ি ফিরতে হোল তাকে।

ট্রামের ভদ্র মহিলাটিকে সবাই মিলে জোর করে নামিয়ে দিল : লেগে গেছে !

এইমাত্র ওদের চারটে হ'য়ে গেল...খবর দিল এসে একজন।

কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না।

এহে, কে আমার দরদী এলেন রে ! জানেন রাজাবাজারে কি হয়েছে ?

নিজ থেকেই একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করে লোকটা।

কি হয়েছে মশাই ? কি হয়েছে ?

ছোটখাট একটা ভীড় বুকে এলো।

আমিত' এই এলাম রাজাবাজারের ওপর দিয়ে কিছু দেখলাম না ত'

ওই হোল, রাজাবাজারে না হোক শেয়ালদা'য় হয়েছে—ওই একই কথা !



তারপর আর দেখা গেল না লোকটাকে ।

একটা পাগল কি মনে করে তিনবার হাততালি দিল । আশ্রয়ভ্রষ্ট পায়রার  
ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে ঘুমে বেড়াল কয়েকবার । একটা ট্রাম এসে থেমে  
গেল—আর যাবে না । সূর্য হয়ে গেছে ।

এতক্ষণ তবু সাহসে ভর করে দাঁড়িয়েছিল ইরশাদ—কিন্তু আব ভাসা নেই ।  
আকাশে বাতাসে খবর এসেছে—সূর্য হয়ে গেছে ।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে নি ইরশাদ । কিছু একটা হয়েছে—জটিলার মধ্যে  
এসে দাঁড়িয়েছিল সেও ।

কি হয়েছে ?

কেউ জবাব দিল না । তফাৎ যাক, ইরশাদ তফাৎ ।

বাপারটা ঠিক বুঝতে পাবে না ইরশাদ । একটা থমথমে আতঙ্ক অবশ  
করে আনে ।

জাহান্নামের শীতল নিশ্বাস লেগেছে—হিমহিমিয়ে আসে বুকেব ভিতরটা ।

নাঃ দু দিনও শান্তিতে বাস করতে দেবে না—

অফিস যাত্রী ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছেন ।

যতসব গুণ্ডাদের কাণ্ড

কলেজের ছাত্রটি বিক্ষুব্ধ ।

বাই বলুন মশাই, একেবারে ঝাড়ে বংশে নিধন না করতে পারলে শান্তি নেই ।

ওরা যেখানে বেশি, সেখানে তো আপনাদেরও নিধন করতে পারে

তা হোক, তবু শত্রুর শেষ রাগতে নেই

জটলা বাড়ছে । লেগে গেছে ।

মুখটা ভরে উঠেছিল একটা নোনতা স্বাদে । পুতু ফেলতেই দেখা গেল  
খানিকটা তাজা লাল রক্ত । তারপর সেই লাল রক্ত কালসে হয়ে জেগে  
রইলো রঙচো দেওয়ালের ওপর ।

তারপর কাশীটা লেগে থাকলেও আর কোন দিন রক্ত ওঠেনি।

ও কিছু নয়, গলাটা চিড়ে গিছল সম্ভবত—এক ডোজ ক্যালকেরিয়া ফস  
থেলেই সেরে যাবে।

বিনয় তাই বোঝাল নিজেকে—কারণ অফিস কামাই করা চলবে না।

আন্তর্জাতিক হিমেল কালো হাওয়া বয়ে গেল অফিস অঞ্চলের ওপর দিয়েও।

ট্রাম বাস চলছে তো? কি করে ফিরবো?

লাগালো কারা?

বেশ ছিলাম কিন্তু ক'টা দিন শান্তিতে—আবার তো সেই প্রাণ হাতে  
করে অফিসে আসা!

মনে পড়লো বিনয়ের ঠাকুর প্রণাম করে আসা হয়নি আজ। আর  
বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো।

যদি কোথাও কিছু হয় পথে।

কিছু না, সম্ভবত গুজব!

কিন্তু বা রটে তার কিছু বটে

কিন্তু লাগালো কারা?

ওরাই—উত্তরের গুহ্য ভাবতে হয় না।

ক্যানিং ষ্ট্রীটে একজন পথচারীর কাছ থেকে আর একজন ঠিক ঐ একই  
উত্তর শুনলো।

আর ভরসা নেই।

বোথার ছিল লেডকীর—দাওয়াইর পরমাটা ওঠে নি, কারবার গোটাতে  
ইচ্ছে করে না। কিন্তু আর ভরসা নেই। লেগে গেছে। কেমন যেন হিংস্র  
দেখাচ্ছে লোকগুলোকে।

আসবার সময় কৈদেছিল কতিমা! আব্বাজান মাত্, যাইয়ে

বড় অবুঝ মা মরা যেয়েটা। দাওয়াইয়ের পয়সাটা তো চাই।

মেওয়া লিয়ে আসবো : বুঝিয়ে রেখে এসেছে ইরশাদ।

মাত যাইয়ে : বড় অবুঝ ফতিমা। আসবার সময় মানা করেছিল।

দাওয়াইয়েব পয়সা ওঠে নি, কারবার গুটোতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আর ভরসা নেই। হিংস্র দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। পাগলটা পমকে এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলে যাও ভাই, আর থাকাটা ঠিক নয়..বন্ধ ভদ্রলোকের কথায় যেন খেয়াল হল ইরশাদের।

চলা যাইয়ে—

খাঁকামুটে গোছের একজন জিনিসগুলো গুছিয়ে দিল। জিনিস অবশ্য সামান্যই। কিছু খাতা পেন্সিল, কিছু আমেরিকান চিকনী আর কিছু ডিসপোজালসের চকোলেট।

যা লিবে তা ছ'আনা।

জানালায় শঙ্কা কুটিল নাবী মুখটি দেখা গেল আর একবার। আক্ষিসে তো! গেছে লোকটা, কি আবার হোল কে জানে! বিনয় বাড়ি ফেরা পূর্ণস্তু জানালা আর ছাদ—ছাদ আর জানালা করতে হবে সরমাকে।

হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করেছে লোকগুলো। হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসে সবমাব। কেন যে লোকগুলো অমন মারামারি করে মরে!

থবব এসে গেছে ফতিমাদের বস্তিতেও।

পমকে বসে রইলো মিঞা আবদুস শোভান।

আববাজান। শোভান ভাইয়া, আববাজানত নেই আয়া আভিতক।

মানা না শুনেই বেরিয়ে গেছে ইরশাদ।

ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

আর দেবী নয় হেঁটেই রওনা দিতে হবে। কোথায় কখন কারফিউ দিয়ে দেয় কে জানে।

ট্রাণ্ড রোড দিয়ে যাওয়াই সেফ—কি বলেন ?

সায় দিল বিনয়।

দাক্ষার ভয় করি না, ভয় মিলিটারীর—শালাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে !

তবে ভরসা এই এবার গভর্ণমেন্ট আমাদের হাতে

তাহলে কি হয়—আমাদের নেতারা আবার বেশি সাধু যে !

কিন্তু যাই বলেন, কাজ ভাল হল না

বড় দেবী করে ফেলেছে ইরশাদ।

জাহান্নামের আগুন লকলকিয়ে উঠেছে চারিদিকে।

আসছে, আসছে

চারিদিকে ছুটেতে আরম্ভ করেছে মানুষগুলো।

শালা পালাচ্ছে

ইয়া, আল্লা

মার, শালাকে !

আহা হাঁ ছেড়ে দাও না, বুড়ো মানুষ—

কেরে দরদ দেখানেওয়ালে ?

ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পরে ছাত্রটি।

আব্বাজাম, মাত যাইয়ে !

আসবার সময় মানা করেছিল লেডকি।

মার শালাকে !

রাতে বিছানায় শুয়ে প্রহরা আবার মনে এলো বিনয়ের। দেওয়ালের ওপর রক্তের সেই কালো দাগটা দেখে উদয় হল প্রহরা।

ফুটপাথে জমাট বাধা রক্তের দাগটা দেখবার পরই প্রশ্নটা মনে জেগেছিল বিনয়ের। কিন্তু লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেছে আগেই। শুধু কয়েকটা খাতা, কয়েকটা পেন্সিল, কয়েকটা আমেরিকান চিহ্ননী, আর ডিসপোজালসের চকোলেট কিছু রক্তে মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে আছে।

রক্তের ওপর চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠেছিল বিনয়ের। আতঙ্কের ধাক্কাটা কেটে যাবার পর প্রশ্নটা মনে জেগেছিল : হিন্দু না মুসলমান।

কিন্তু লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেছে।

ফুটপাথে জমাট বেধে কালসে হয়ে আছে রক্তের দাগটা—দেয়ালের সেই রক্তের দাগের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই।

লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেছে—আর শুধু রক্তের দাগ দেখে বোঝবার উপায় নেই, হিন্দু না মুসলমান।

## দারোগার বেঁ

এরি নাম বোধ হয় নির্বন্ধ। পরীক্ষায় পাস তো করলই ছবি—একি  
কি দেনা পাওনার ফাঁড়াটাও কেটে গেল নির্বিঘ্নে।

শাস্ত্রেই আছে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ তিনের ওপর কারো হাত নেই  
নইলে এব থেকে কত খারাপ সম্বন্ধ কত সামান্য ওজরেই না ভেঙে গেল  
রসময়বাবু তো আশাই করতে পাবেননি, এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিচ্ছেদ  
দিতে পারবেন তিনি। কিন্তু প্রজাপতিব নির্বন্ধ তো আব মিথ্যা হবার নয়।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। দ্বিতীয় পক্ষ, তাহোক—ছেোটো দারোগা।  
বয়স বেশি নয়—ছেলেপুলেও নেই। স্ততরাং আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া  
বইকি। গায়ের লোক যদি ছবিরাগীর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়, তাহলে তাদের  
দোষ দেবার কিছু নেই। কেউ যদি দ্বিতীয় পক্ষের কথাটাই জোব করে খুঁচিয়ে  
তুলতে চায়, তাদেরও মার্জনা করা যায়।

বিবাহের আয়োজনটা তাই একটু ঘটা করেই হ'ল। ঘটা মানে,  
রাজস্বয় ব্যাপার তা নয়। তিনদিন আগে থাকতে যে নহবৎ বসেছিল ও  
নয়—তবু পাড়াগাঁয়ের পক্ষে একে ঘটাট বস্তু হবে। নহবৎ না বস্তুকি  
আত্মীয়-স্বজন থেকে আরম্ভ করে পাড়ার কোন লোককেই আর নিমন্ত্রণ  
করতে বাকি রাখেননি রসময়বাবু। রোদ ঝিমিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুখর  
হয়ে উঠেছে বাড়িটা।

বাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন, সেই ছবিরাগী কিন্তু ঘেমে উঠছে।  
না, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, কোন পূর্বরাগের ব্যাপার নয়। আর তা  
ছাড়া বিয়ের রাতে কোন মেয়েই আর ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা  
ঘামায় না।

তবু ছবিরাগীর সমস্যাটা যেন আজ বড় দ্রুত কেটে গেছে। ছপ্পরের কয়েক  
ঘণ্টার মধ্যেই যেন বিকেল হয়ে গেল, আর তারপরই এসে গেল লয়। তারপর

কখন যে সাতপাক ঘোরা শেষ, কখন যে শুভদৃষ্টির অহুষ্ঠান সমাপ্ত, কিছু মনে যতে পরেছে না ছবিরাণী। হঠাৎ ছবিরাণী নিজেকে আবিষ্কার করলো বর ঘরে।

ঘামের আর দোষ কি! দোদ-গুপ্রতাপ দারোগা রাসবিহারীর সঙ্গে চোখা-খে হলে দুর্দান্ত ডাকাতের অদ্ভুত বুক কঁপে ওঠে—ছবিরাণী কোন ছাড়! মতিষমুণ্ডার ঈশেন ডাকাত—পুলিস অদি বার ডবে কাঁপে; রাসবিহারীর ‘ধু চোখের দৃষ্টির সামনেই কবুল করে ফেলেছিল সব। এর আগে ছোট দারোগা তিনখানা বেত ভেঙেছে ওর পিঠে—রা’টি কাড়েনি ঈশেন।

অমন রাশভারী দারোগা রাসবিহারী যদি ছবিরাণীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, যদি একটু হাসবার জ্ঞান মিনতি করে, যদি নেহাত হেগেমানুষের মত তাকে পছন্দ হয়েছে কিনা সিজ্ঞাসা করে, আর শেষ পর্যন্ত অমন পালোয়ান লোকটা যদি জড়িয়ে ধরে এবং রাসবিহারীর বুকের চুল নাকে ঢুকে যদি হাঁচি পায় এবং তা সত্ত্বেও যদি ভয়ে হাঁচতে না পারে—তা হলে ছবিরাণী ঘামবে না কেন। কোন কলোজ-পড়া ফিচেল ছোকড়া নয়, সওদাগরী অফিসের টে কেবানী নয়—দস্তুরমত জলজ্যান্ত একটি দারোগা।

তা ছাড়া, পুলিস জাতীয় জীবটির ওপর কেমন একটা ভয় ছবিরাণীর ছলেবেলা থেকেই। অবশ্য ছেলেপুলেদেব পুলিস-ভীতি একটা পাকেই—‘পুলিসে দেব’ বললেই সব ছুটুমি ঠাণ্ডা! কিন্তু ছেলেপুলের নাম কবে এড়িয়ে গেলেই বা শুনছে কে! অন্তত ছবিরাণী তা শুনবে কেন!

এই তো সেবার—ছবিরাণী তখন নেহাত ছোটও নয়। ফ্রক ছাড়বো ছাড়বো করছে। তা তখন প্রায় বছর বারো এই রকম বয়স হবে বইকি ছবিরাণীর। সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছিল ছবিরাণীদের বাড়ি। উঃ মাগো, সে কথা মনে হলে এখনও বুক কঁপে ওঠে ছবিরাণীর। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছিল চোরটা। ধরা পড়ে জোয়ানমন্দ বেটার সে কি কারা! বতখুসি

মার্কন বাবু—দোহাই আপনাদের পুলিশে দেবেন না...ছেলেপুলে মরবে... মার্কন বাবু, রক্ত বার করে দিন মেরে...দোহাই বাবু দেবেন না।

অমন জেয়ানমদ্দ বাদের নামে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে পারে, তা' দেখে ছবিরানী ভয় পাবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

ওরা সব পারে। এইতো কয়েকমাস আগে, মামাবাড়ি কলকাতা ছবিরানী। মা-ই পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে একটু আদব কাষদা আসার জন্য। আজকালকার ছেলেরা আবার আদব কায়দাটাই

কলকাতায় দেখে এসেছে ছবিরানী। একদল ছেলেমেয়ে যাচ্ছিল দলবঁধে, চিংকান করতে করতে। কারোর বাড়িতে সিঁদ কাটেনি, কারো পাকা ধানে মইও দেয়নি! তবু ঐ লাল পাগড়ীগুলো এসে কি মারই ছেলেগুলোকে! মেরে একবারে রক্তগঙ্গা করে দিল! ওরা সব পারে।

কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না ছবিরানী—এ লোকটা এমন কেন! রাসবিহারী ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ দিঘ ফুড়ুস করে নিঃশ্বাস পড়ছে। এ আবার একটা দারোগা! ছবিরানীর—কিন্তু তেমন প্রাণ গুলে হাসবার ভরসা পেল না। বালিদে মুখ গুঁজে হাসির দমকে অসম্ভব শ্রুতানীবি ছবিরানী ফুলে ফুলে উঠছে পরের দিন দারোগা-স্বামীর সঙ্গে ছবিরানী এসে উঠলো বেগমপুর খন

শহরও নয়, গ্রামও নয়—বেগমপুর একটি গঞ্জ।

একটি রেল স্টেশন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অর্ধি অনেকগুলি ট্রেনই দাস্তিকতায় স্টেশন কাঁপিয়ে চলে যায়—থামে মাত্র ছুটি প্যাসেঞ্জর ট্রেন। তেতালান্ন নিম্নতে নিম্নতে এই ট্রেন দু'টি আসে আর যায়—তবু এই সমা প্রাণচঞ্চল সজীব দেখায় বেগমপুরকে।



দাঁপারীবা মাল কিনতে যায়, সওদাগরী অফিসে চাকরিও করে অনেক।  
 ১৭ চারপাশে আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে একটা গঞ্জ। শনিবার  
 মজলবার হাট বসে। দূর দূরান্তর থেকে লোক আসে সওদা করতে। চুরি  
 স্কাফতি এদিকটায় লেগেই থাকে। বেগমপুৰ থানার তাই অসম্ভব পসাব,  
 বেগমপুরের বাশভারী দাবোগা রাসবিহাবীব প্রতিপত্তিও অপ্রতিহত।  
 ১৮ নষ্টী সকলে সবছে পরিহার করেই চলে।

রোগব বৌ ছবিরাণী, বাঘিনী না ভোক বাঘের বৌ। নকিপুৰের বসময়  
 ছবিরাণীকে সকলে অবজ্ঞা করতে পারে কিন্তু রাসবিহাবীর বৌকে  
 কাব ঘাড়ে এমন মাথা আছে! তবু ছবিবাণী সকলের  
 সাথে মিশতে চেষ্টা কাবছে। কিন্তু দেখানেই বাও সমস্ত হয়ে গুঠে সকলে।  
 ১৯ মেশাব চেষ্টাটা ছবিবাণী তাই ছেড়েই দিয়েছে।

বেগমপুর থানাটা সাবাদিন বসে বসে ঝিমোয়। দুপুরবেলা একঘেয়ে স্তবে  
 দুন্দীদাস আরতি কবে সিপাই বামধাবী :

ভয়উ মনোরণ সফল তব

সুস্থ গিরিরাজ কুমাৰী

পবিহক ভঃসহ কলেস সব

অব মিলহহি ত্রিপুরাবী।

২০ রোজে কিছু চেগাবা সম্পূর্ণ বদলে যায় বেগমপুর থানাব। অন্তর্হিত হয়  
 রামাধারীব শান্ত সমাহিত ভাব। কর্মব্যস্ত বেগমপুর থানা। সদরে চালান  
 আগে কবুল করাতে হবে আসামীকে। ডাক পড়ে রামাধারীব।

২১ সব শালা ছিচকে চোর। তেল পাণ্ড্যান পাকা বেতটা হাতে  
 ২২ শ্রীর কত্রকপ দেখলেই সব শালা কবুল করে ফেলে। হাব মেনেছিল  
 ২৩ রামাধারী একমাত্র ঈশেন ডাকাতের কাছে। কল্জেন জোর ছিল শালাব!  
 ২৪ তনটি বেত ভাঙলো, তবু রাটা কাড়লো না! কিন্তু রাসবিহারী আসতেই  
 ২৫ বন সাপের মাথায় ধুলো পড়লো। ঈশেন জীপ-চালান হবার পর আর

একটাও মরদ চোখে পড়েনি রামধারীর। এক ঘা কবলেই হাঁউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে ভেড়ুয়ার দল।

কবুলিয়ৎ নামা লিখে সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা করে কোর্টারে ফিরতে রাত হয় রাসবিহারীর। রান্নাবান্না শেষ করে বিমোয় ছবিরাণী।

এক শালা 'কিছুতেই কবুল করবে না...দোহাই বাবু আমি কিছু করিনি... করিসনি বেশ করেছিল...চালান দিতে হবে তো কাউকে...কবুল না করলে চলবে কেন...দিলুম শালাকে ছ'বা...বাস বাছাধন সুর সুর করে কবুল করে ফেললো...সব...হ্যাঁ বাবু, আমার নাম রাসবিহারী দারোগা

রূপকথার রাজপুত্র রাসবিহারী !

কাঁদলে লোকটা ? রক্ত বেরল ?

অন্ধকার বেড়ালের মত চক্চক্ করে ওঠে ছবিরাণীর কঁতকঁতে চোখ দুটো। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হাঁপায় মেয়েটা।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ে রাসবিহারী। আর ঘুমন্ত রাসবিহারীকে দেখলেই হাসি পায় ছবিরাণীর।

ঘটনাটা কি, কিছু ঝাঁচ করতে পারছে না ছবিরাণী।

চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে বেগমপুর থানার। রামধারীর তুলসীদাস আবৃত্তি বন্ধ। কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। বর্ষণের আগের গুমোটের মত স্তব্ধ রাসবিহারী।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো ছবিরাণী—শীতের বেগমপুর রিক্ত। পাতা স্বরতে শুরু করছে—থানার প্রাঙ্গণের নিমগাছটা রিক্তশাখা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ঢেউ উঠছে সোনালী ধানের শীষে। চোখ জুড়িয়ে আসে।

কিন্তু ঘটনাটা ঝাঁচ করা যায় না কিছুতেই। ডপুর বেলা একবার এসে সাত তাড়াতাড়ি খেয়ে গেছে রাসবিহারী। ব্যাশার কি, জিজ্ঞাসা করেছিল

ছবিরাণী। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। মেয়ে মানুষের ওসব কথায় দরকার কি!

তালগাছের ঝাঁকড়া মাথার উপর দিয়ে, রিক্ত নিম্ন গাছের ডাল বেয়ে একটা অতিকায় সরীসৃপের মত রাত্রি বনিয়ে এলো বেগমপুরে।

কিসের একটা গোলমাল। জানালায় এসে দাঁড়াল ছবিরাণী। কৃষ্ণকায় মানুষের শ্রোত নেমে এসেছে বেগমপুরের মাঠে মাঠে—অন্ধকারের মাঝে একটা বিচিত্র সিলুয়েট। সমুদ্র গর্জনের মত ভেসে এলো একটা শব্দ। গর্জে উঠলো বন্দুক—একটা আগুনের ঝলক। অসহায়তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ছবিরাণী। ওরা সব পারে!

দরজা খোল, দরজা খোল শীগ্গীর!

হাঁফাচ্ছে রাসবিহারী। পালিয়ে এসেছে রাসভারী দারোগা রাসবিহারী।

কিন্তু কে দরজা খুলবে। ঘরের মধ্যে বইছে একটা উত্তাল হাসির ঝড়। হাসির দমকে অসমৃতা ছবিরাণী ফুলে ফুলে উঠছে। \*

## দুষ্মণ

পাহাড়তলীর ছোট্ট শহরটা সারাটা বছর ঝিমিয়ে থাকে। শীতের আমেজ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয় স্বাস্থ্যসেবীদের ভীড়। তিন চারটা মাস প্রাণ-চঞ্চল দেখায় শহরটা। বিয়ের কনের মত সেজে ওঠে মনোহারী দোকানগুলি। শহর-বাজারে গায়ে গা না ঠেকিয়ে ঢগাফেরা করাই দায়। সারাটা বছর বাহাজুর-মার্কি হিন্দী বই দেখিয়ে কোন রকমে টিকে-থাকা সিনেমাটার আসবে নতুন নতুন বাংলা বইয়ের জোয়ার। নানা রঙের শাড়ী, প্রসাধনের কড়া গন্ধ আর দামী সিগারেটের খোসবুতে সজীব হয়ে উঠবে শহরটা।

টাক্সাওয়ালাদের মরশুম এই সময়টা। কলকাতার গাড়ি আসার আগেই ওরা ভীড় করবে ষ্টেশনে। তারপর গাড়ি আসবে। দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ সজীব হয়ে উঠবে শহরটা। কুলী, কুলী... যাদের লটবহর আছে তারা তারম্বরে চেচাতে শুরু করবেন। শহরে মেয়েটির ভালো লাগবে ইতস্তত পাহাড়ের হাতছানি। প্রাণ ভ'বে একটু মুক্ত হাওয়া টেনে নেবেন স্বাস্থ্য-দেবা রোগাগিলগিলে ভদ্রলোক।

কুলীটা আবার কোথায় গেল! স'রে পড়বে নাকি। কুলী, কুলী...

ওজন দিতে হবে, আপনার মাল বেশি আছে। সারাটা বছর উপোসী থেকে ওরাও কিছু আশা করে এই সময়টা।

কোনকথা থেকে এতখানি এলাম, কেউ কিছু বন্দো না আর আপনি...

সে বন্দো কি আর হয়? ওজন দিতে হবে! মাল বেশি না হ'লে ভয় কি আপনার...

যাক্কে দিয়ে দিচ্ছি কিছু—ঝড়টা! হিসাবী ভদ্রলোক নগদ একটা আধুনী বের ক'রে দেন।

টাক্সা হবে বাবু, টাক্সা?

কোথা যাবেন বাবু বিলাসী ? চলুন গিয়ে যাচ্ছি  
 ইদিকে আসুন বাবু, লতুন টাঙ্গা। পক্ষীবাজ ঘোড়া •  
 কত, নিবি কত ? দর না ক'রে উঠবেন হিসেবী ভদ্রলোক।  
 সবাই যা লেয়, আমি কি আব বেশি লিব বাবু  
 তবু কত লাগবে ?

এক টাকা দেবেন, বিলাসী যেতে আর কত লিব !  
 এক টাকা ? ডাকাত নাকি ! বাবো আনায় বাবি ? বারো আনা ?  
 বারো আনা কি বাবু ! লতুন টাঙ্গা !  
 তাহ'লে বাপু আমি পুরোন গাড়িই নেব

আচ্ছা, আচ্ছা চলুন বাবু। পুরোন গাড়িতে গিয়ে গাছড়ায় গিরবেন—  
 আপনাব সঙ্গে কি এক দিনেব কাববার !••

দিন, দিন বিস্তারটা এদিকে দিন। মনে রাখবেন বাবু • সস্তায় লিয়ে  
 বাচ্ছি। বিদেশী টাঙ্গাওয়ালা হামার নাম।

বারো আনাব এক পয়সা কম নামবে না বিদেশী। অথবা অবশ্য দশ  
 আনাও যায়—কিন্তু টাঙ্গাওয়ানাদেব মধ্যে একটু অভিজাত বিদেশী। চমৎকার  
 নীল বড়, পুরু স্প্রিংয়ের গদি আব পক্ষীবাজ ঘোড়া। ঘোড়াটা সত্যি ঈর্ষাব  
 বস্ত। মাম্বব-সমান উঁচু, সাদা ধবববে রঙ—ঘোড়াটাব নাম রেখেছে বাজা।

একশ্রেণ সওয়াবী পৌঁছে দিয়ে এসে ঘোড়াটকে একটু বিশ্রাম দেবে  
 বিদেশী। চারটি চানা আব জল বালুতীতে ক'বে প্রথমে ধ'বে দেবে রাজাব  
 সামনে।—লে আরাম কর বাজা !

পিঠেব ওপর ছোট একটা চাপড দেবে বিদেশী। পাখাটা সাথে গাড়ি  
 টানা কি সোজা তকলিফ !

তারপর চায়ের দোকান।

ক্ষেপ মেয়ে এসে সবাই ভীড় করে চায়ের দোকানে।

দে ওর খোড়া! দোকানী একেবারে যতটা চা দেবে তাতে কেউই খুসি হয় না ওরা—আবদার জানানোটা ওদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

চা-ওয়ালা অবশ্য এ আবদারে মোটেই কান দেয় না। শেষ পর্যন্ত একটু গরম জল পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় ওরা। গরম জল খয়রাৎ করতে অবশ্য কার্পণ্য করে না চা-ওয়ালা। বাঁশের চট্টার হাতল লাগানো সিগারেটের কোটোটার ক'রে জল ঢেলে দেয় তাদের গ্লাসে।

তারপর উদ্বেগহীন আলাপ চলে।

আজ যা একটা সোওয়ায়ী উঠেছিল। ক'লকাতার লেড়কি। শালা চুলে কি খসবু গাখটা যেন এখনও পাওয়া যাচ্ছে এমনভাবে একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে নেয় বাসদেও।

দেখেছিল কেমন তাকাচ্ছে রাজাটা, শালা ভারী বুঝ্‌মান আছে...

শালা সারাদিন কেবল রাজা আর রাজা—সাদী ক'রে লে রাজাকে তুই দিমাগ খারাপ ক'রে দেয় বাসদেওয়ার।... উ শালা কি খসবু!

কথাটা সেদিন জুলালীও বলেছিল। খুন চ'ড়ে গিছিল বিদেশীর। রাজার ছুষ্মগকে দেখে লিবে। সে জুলালী হ'লেও মান্বে না বিদেশী।

অথচ জুলালীর কি দোষ? রাত ন'টার ট্রেনের ক্ষেপটা মেয়ে এসে মাছুষ নাহা-খাওয়াটা সেয়ে নেয়। তা নয়, বিদেশী এসে লেগে যাবে ষোড়টাকে গোসল করতে।

কড়া বুরুষ দিয়ে মেজে দেবে ওর সমস্ত শরীর। আরামে রাজার সাদা চামড়াটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তারপর ওকে দানাপানি দিয়ে তবো নাহা সারতে যাবে বিদেশী।

জুলালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু কাঁহাতক সহ করা যায়। কতক্ষণ

খাবার আগলে ব'সে থাকবে সে। তবু যদি নিজের ষোড়া হ'ত! ষোড়া তো সে বঘুবর মান্নির!

গুম হ'য়ে থাকে বিদেশী। রাজার ছুমণকে সে মাক করবে না কখনও। সে ছলানীই হোক আর বেই হোক।

কিরে নারাজ হইলি? ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ছলানী।

ওর শরীরের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতে পারছে বিদেশী। কিন্তু রাজার ছুমণ উ। হোক সে ছলানী!

তু রাজার ছুমণ—মাফ সে কিছুতেই করবে না ছলানীকে। রাজার ছুমণ, বিদেশীরও ছুমণ।

আমি রাজার ছুমণ হ'তে যাব কেন রে? ওকি আমার সতীন! প্রগলভ হয়ে ওঠে মেয়েটা। মনটা কি রকম নবম হয়ে আসে বিদেশীর। কিন্তু ছুমণ উ!

আগে বাজাকে সাদী ক'রে লে, তবে ত' উ হামার ছুমণ হবে—তখন সে দেখবি উকে কি করি হামি!

না, তুহ বহৎ বেঙামিজ আছিস! কথাটা বেশ বলছে ছুঁড়ী। সাদী... যাক্ এবারের মত মাপ ক'রে দেওয়া যেতে পারে ওকে।

মহুয়াব নেশার ঘোরটা এবার একটু অনুভব করা যায়। বিকেলে কেনা বেগ ফুলের মালাটা ছলানীকে উপহার দেওয়া যেতে পারে।

গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যবেদীরা ফিরতে শুরু করে। ক'টা দিন খুব ব্যস্ততা। তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়বে শহর। বাজারে লোক পাতলা হ'য়ে আসবে। মিইয়ে বাবে মনোহারী দোকানের সমারোহ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মল্লয়া, তাল আর শালের সারি রিক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের তলা থেকে বেরিয়ে পড়বে দগ্ধ লাল মাটি। ছপ্পুরে আগুনের মত গরম হাওয়ায় ধুলির ঝড় উঠবে। জনবিরল শহরে কে আর টাঙ্কায় ওঠে। টাঙ্কার জমাই উঠতে চায় না কোন রকমে।

শহরে কি আর মানুষ থাকে এই সময়টা? থাকে তো কলকাতার বাবুদের সৌখীন বাড়িগুলো আগলবার জন্ত কতকগুলি মালী। খোঁপায় পলাশ ফুল গুঁজে ঘুরে বেড়ায় কিছু সাঁওতালী মেয়ে। পোষ্টাপিস আর থানার কিছু বাঙালী বাবু আর স্থানীয় বাসিন্দে কয়েকশ' ঘর। এ লোকগুলোর ঠ্যাংয়ের তাগদের বলিহারী। উঁচু নিচু পাহাড়ী বন্ধুর পথে মাইলের পর মাইল হাটতে ক্লান্তি নেই। বাজার মন্দা যায় এ সময়টা। তবু সওয়ারী ছ'চার জন পাওয়াই যায়। থানার গৃহিনী পোষ্টাপিসে বেড়াতে গেলে বিদেশীর ডাক পড়ে। তা ছাড়া, থানদানি বরের পর্দানশীন জেনানা আছে, ইষ্টিশনে কিছু কিছু লোক সব সময়ই যাতায়াত করে। শহরে আর কোন বিশেষ যানবাহন নেই। পাহাড়ী পথে সাইকেল রিক্সা অচল, রিক্সাও নেই বললেই হয়। স্তুরাং টাঙ্গাওয়ালাদের ডাক পড়বেই!

অবশ্য চেঞ্জের মরশুমে বা পাওয়া যায় তাতে এ ক'টা মাস চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু হাড়কুস এই রঘুবর মাঝি। এই বে-টাইমটাতে থানা কমিয়ে দেবে ঘোড়ার। শালা মালিক। জিনিসের বহু জ্ঞানেনা, তবু মালিক। শালা ছয়মণ উ! হোক ছলালীর চাচা। শালা ছয়মণ! কিছু রোজগার করতে পারলে নিজেই কিনে লেবে রাজাকে। খেতে দেয় না মালিক। হোক ছলালীর চাচা, ছয়মণ উ।

চেঞ্জের মরশুমের সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা ট্যান্ডি এসে হাজির হ'ল পাহাড়তলীর এই ছোট্ট শহরে। সামনে টাঙ্গা পড়লে পক পক ক'রে হন' দিতে থাকে। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে চায় ঘোড়া—এক পাশে সরে গিয়ে পথ ক'রে দিতে হয়।

কলকাতার লোকগুলোও যেন ট্যান্ডি পেলে ব'র্তে যায়। টাঙ্গায় এক-ফ্রেপ মারতে মারতে ছ'ফ্রেপ মেরে দেয় ট্যান্ডিওয়ালা। দেমাকে পা পড়ে না শালায়। হাওয়াগাড়ির গাড়োয়ান কথাই বলতে চায় না ওদের সঙ্গে।



চায়ের দোকানে একটা চাপা আক্ৰোশ ফেনিছে ওঠে ।  
 শালাব বোয়াব দেখেছিছ্ । দোব একদিন গাড্ডায় গিরিয়ে ।  
 কোথায় থাকে শালা ?  
 লাল চোখে ভয়ঙ্কর দেখায় এবশাদকে ।  
 জাহান্নামে আবার কোথায় ।  
 পেছন থেকে এসে কেবল ভোপো ভোপো—দেব একদিন শাপাকে ।  
 নীরবে চা খেবে উঠে যায় বিদেশী ।  
 ঋক্বেকে ট্যাক্সিটার কাছে স্নান দেখায় ওব টান্দা । পক্ষাবাজের আভিজাত্যে  
 কেমন বেন ভাঙন ধরেছে ।

ভোপো ! ভোপো !  
 হস্তিনেব রাস্তা থেকে বাজারের বাস্তাব বাকটা ধবংহ দেখা গল বুনো উড়িয়ে  
 আসছে হলদে বড়র হাওয়াগাড়ি ।  
 ভোপো ! ভোপো !  
 কিন্তু বাজা কোন গাড়ি পছন্দ পড়েনি আজ পর্যন্ত ।  
 কচ্যা কচ্যা  
 চাবুকটা একবার ঘুবিয়ে দেয় বাজার ওপব দিয়ে । পক্ষীবাজ যেন ডানা  
 মেলে দিয়েছে । খটাখট্ . খটাখট্ ..পাহাড়ী পথে গুরব শব্দ প্রতিবন্ধিত হচ্ছে ।  
 বাত হ'লে দেখা গাত আগুন ছিটকোচ্ছে ।  
 করছো কি, উল্টে যাবে যে  
 কলকাতার মেয়েটা ভয় পেয়েছে ।  
 না দিদিমণি, ওচাবে কি, আমার নাম বিদেশী । কিন্তু এগিয়ে আসছে  
 হাওয়াগাড়ি, এগিয়ে আসছে ।  
 কচ্যা কচ্যা, আরো জোরে, জোরসে

ঝাঁকুনি লাগছে—ছ'থানা চাকার মধ্যে মড়মড় করছে কা  
কচ্যা...কচ্যা—জীবনে এই প্রথম চাবুক পড়লো রাজার পিঠে  
থামো থামো

চিৎকার করতে শুরু করেছে স্বাস্থ্যবেধী ভদ্রলোক আর মেয়েটা,  
ভোঁপো, ভোঁপো!

একেবারে পেছন থেকে হন' দিচ্ছি হাওয়াগাড়ি। শালা ছুমণ। সান  
ছটা পা তুলে লাফ দিতে চাইছে রাজা।

কচ্যা...কচ্যা

পাংগলের মত আর এক বা চাবুক কষালো বিদেশী। তাবপর হাওয়াগার  
একস্হট্টে পাইপ থেকে পেট্রলের গন্ধ মেশানো খানিকটা গরম ধে  
লাগলো বিদেশীর নাকে চোখে মুখে।

আদালতেব মধ্যেই কঁাদতে শুরু করেছে ছ'থানীটা। কিন্তু জা  
গেছে শালা পক্ষীবাজেব ছুমণ। লোহার ডাঙাটা তুলেছিল বিদেশী মোগ  
কিন্তু যত সব ভেড়ুয়ার দল ধ'রে ফেললো। এবশাদ, বাসদেও  
বাত শালাদের। কি আর হবে, বডজোর জেহল হবে ছ'এব  
দুলালী কঁাদছে, কাহুক। জানে বেঁচে গেল শালা ছুমণ।







